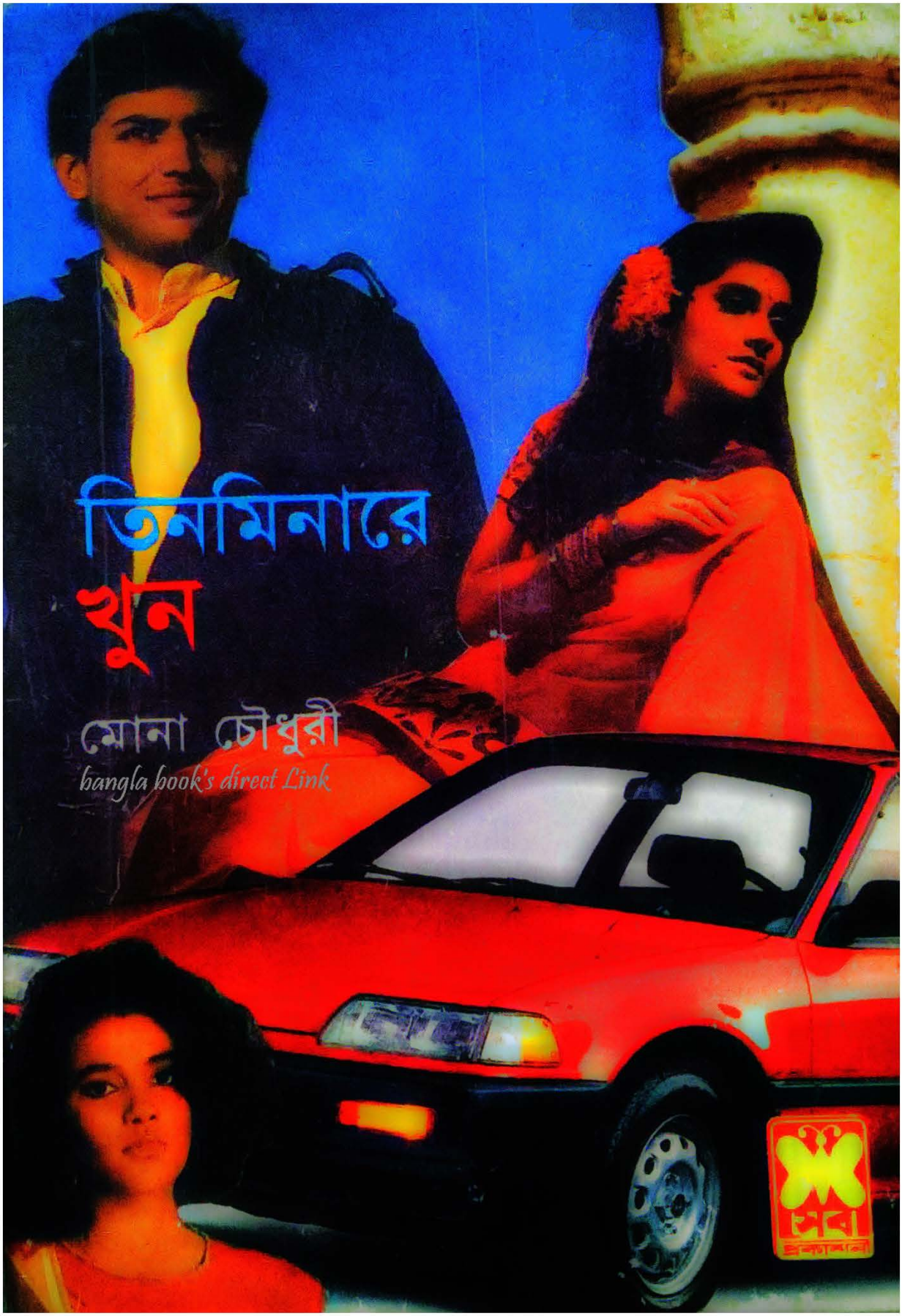

তিনমিনারে খুন

মোনা চৌধুরী

bangla book's direct Link

bangla book's direct Link

তিনমিনারে খুন

আগাথা ক্রিস্টির কাহিনী অবলম্বনে

একখণ্ডে সমাপ্ত রহস্যোপন্যাস

মোনা চৌধুরী

তিনমিনার!

লাল মাটির টিলা আর শালগজারীর ঘেরা টোপে ঢাকা

বিশাল প্রাসাদ। হঠাৎ সেই দুর্গের মতো বাড়িটির ভেতর

খুন হয়ে গেলেন শিল্পপতি মোবারক চৌধুরী।

বাড়িতে থাকে অসংখ্য লোক। এবং জানা কথা—

খুনীও বাইরের কেউ নয়।

তদন্ত চলছে, পুলিসের সতর্ক প্রহরা…এরই মধ্যে আবার খুন।

কিছু বিচিত্র চরিত্রের নরনারীর বিচিত্র আচার-আচরণ।

অভিশপ্ত বাড়ির আনাচে-কানাচে কলম ও ডায়েরী হাতে

ঘুরে বেড়ায় গোয়েন্দা বইয়ের পোকা কিশোরী টিনা।

অদ্ভুত সব কথা বলে।

যারা গ্রেফতার হলো, তারাই কি আসল খুনী?

সেবা বই

প্রিয় বই

অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো—রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

সেবা প্রকাশনী

আগাথা ক্রিস্টির কাহিনী অবলম্বনে

উপন্যাস—৭৩

তিনমিনারে খুন

মোনা চৌধুরী

প্রকাশক :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : আলীম আজিজ

রচনা: বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে

মুদ্রণ :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা :
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৪০৫৩৩২
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

শো-রুম :
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

TIN MINAREY KHUN
By: Mona Chawdhury

তেইশ টাকা

স্ক্যান ও এডিটিং: মহিদুল ইসলাম নোমান
ফেসবুক গ্রুপ
BANGLA BOOK'S DIRECT LINK
এর সৌজন্যে নির্মিত

এক

লীনা চৌধুরীর সাথে আমার পরিচয় লণ্ডনে। আমরা দুজনই তখন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পলিটিক্যাল সায়েন্সের শেষ বর্ষের ছাত্র। পরিচয়ের প্রথম পর্বে ভালোবাসার কথা আমাদের কারো মনে উঁকি দেয়নি; তবে তার প্রতি আমি সবসময় একটা প্রবল আকর্ষণ অনুভব করতাম।

সুন্দর একজোড়া চোখ, টিকোলো নাক ও ঘন কালো চুলের অধিকারিণী লীনা চৌধুরী। মাত্র বাইশ বছর বয়স, অথচ তার সাথে কথা বলার সময় নিজেকে খুব অপরিণত ও আনাড়ি মনে হতো। প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস, প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও প্রবল দায়িত্ববোধের সমন্বয়ে লীনার ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছিলো। অতিরিক্ত আত্মসচেতন ছিলো বলে ওর বন্ধুদের সংখ্যা ছিলো নিতান্তই কম। স্বদেশী ছিলাম বলে লাঞ্চ বা ডিনারে একমাত্র আমার তরফ থেকে পাওয়া আমন্ত্রণই ও গ্রহণ করতো। ওর সঙ্গ পাবার জন্য আমি ভীষণভাবে উন্মুখ হয়ে থাকতাম। প্রায়ই আমরা এক সঙ্গে ডিনার খেতাম আর মাঝে

মাঝে পার্ক ও রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়াতাম। বলতে গেলে, আমার প্রবাস-জীবনের একমাত্র অবলম্বন ও প্রকৃত বন্ধু ছিলো লীনা। এক সময় আমাদের বন্ধুত্ব এতোই গভীর হলো যে ক্লাস শেষে রোজই আমরা এক সঙ্গে বের হতাম এবং ডিনার পর্বটাও সাঙ্গ হতো এক সঙ্গেই।

উনসত্তর সালের শেষ দিকে দেশে ফিরে যাবে বলে লীনা মনস্থির করে ফেললো। তাকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করলাম; এমন উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দেশে ফিরে যাওয়া তার জন্য শ্রেফ বোকামি হবে। কিন্তু একগুঁয়ে স্বভাবের মেয়ে লীনা তার সিদ্ধান্তে অনড় থাকলো। আমি তখন সদ্য যোগ দিয়েছি চাকরিতে। চাকরি ছেড়ে দেশে ফিরে যাওয়া তখন আমার পক্ষে মোটেও সম্ভব ছিলো না। তাছাড়া ফিরে যাবার ইচ্ছেও আমার মনে কখনো জাগেনি।

সেই রাতটির কথা আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে। লীনার ঢাকায় ফিরে যাবার আগের দিন রাতে আমি আবিষ্কার করেছিলাম, লীনাকে কতো গভীর ভাবে ভালোবাসি এবং শুধু ভালোই বাসি না, তাকে স্ত্রী হিসেবেও পেতে চাই। এই আবিষ্কার আমার কাছে অবশ্য বিস্ময়কর কিছু ছিলো না; বরং এটা ছিলো পুরাতন এক সত্যকে স্বীকার করে নেয়া মাত্র।

সে রাতে আমরা সান ফ্লাওয়ার রেস্তোরাঁয় ডিনার খেতে বসেছিলাম। লীনার দিকে একবার আড়চোখে তাকালাম। কোনো পরিবর্তন নজরে পড়লো না। নির্বিকারে সে তখন মাটন চপে কাঁটা চামচ চালাচ্ছে। মাঝে মধ্যেই ওর এরকম

নির্লিপ্ততা আমাকে অবাক করতো। তবে এতে আমি কখনো বিরক্তিবোধ করতাম না। বরং তার সেই নির্লিপ্ততাও আমাকে মুগ্ধ করে তুলতো।

এক সঙ্গে বসলে আমি আর লীনা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতাম। রাজনীতি, অর্থনীতি, খেলাধুলো, বন্ধুবান্ধব—প্রায় সব ব্যাপারেই আমরা আলাপ করতাম। তবে লীনা কখনো তার পরিবার সম্পর্কে আমার সামনে একটি শব্দও উচ্চারণ করেনি। আমার সব কিছুই জানতো; অথচ ওর কথা আমি প্রায় কিছুই জানতাম না। তবে এনিয়ে আমি কখনো মাথা ঘামাইনি। আমার কাছে লীনাই ছিলো একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

সেদিন হঠাৎ নিরবতা ভেঙে লীনা জিজ্ঞেস করেছিলো, কি ভাবছো?'

'তোমার কথা।'

'সত্যি?'

'জানি না, কবে ঢাকায় ফিরতে পারবো। হয়তো বছরখানেক; কিংবা দু'বছর লাগতে পারে। ভাবছিলাম, ঢাকায় ফিরে প্রথমেই তোমার কাছে যাবো এবং আমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেবো।'

লীনার মধ্যে কোনো পরিবর্তন ঘটলো না। সেই একই যান্ত্রিক ভঙ্গিতে মাটন চপ কাটতে লাগলো সে। একবার মনে হলো, সে হয়তো আমার কথার অর্থ বুঝতে পারেনি। তাকে বলেছিলাম, 'প্রস্তাবটা আজ রাতে দিতে চাই না। কেননা তা

যদি তুমি প্রত্যাখ্যান করো, তাহলে আমি ভীষণ রকমের আঘাত পাবো। তোমার স্মৃতি নিয়ে লণ্ডনে থাকা আমার পক্ষে দুঃসহ হয়ে উঠবে। আর যদি রাজি থাকো, তাহলে এই মুহূর্তে আমাদের কি করণীয় হবে তা আমার জানা নেই। আমরা কি আজ রাতেই বিয়ে করে ফেলবো এবং কালকেই তুমি ঢাকায় ফিরে যাবে? নাকি এন্‌গেজ্‌মেন্টের পর্ব চুকিয়ে স্রেফ হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবো? দেশে কবে ফিরতে পারবো জানি না। আমার প্রতি তোমার অনুভূতি কি, তাও জানা নেই। দেশে ফিরে তুমি হয়তো এমন একজনের দেখা পাবে যে তোমাকে আমার চেয়ে বেশি খুশি করতে পারবে। তাই এন্‌গেজ্‌ড হয়ে তোমার দেশে না যাওয়াই ভালো। আমি এখনই ঢাকা ফিরতে পারছি না; তবে একদিন নিশ্চয় ফিরবো। তখন তুমি আমাকে তোমার সিদ্ধান্তটা জানাবে।'

আমার মুখের দিকে চেয়ে লীনা স্মিত হেসে উত্তর দিয়েছিলো, 'ঠিক আছে। ঢাকায় ফিরে আমার সঙ্গে দেখা করো। অবশ্য তখনও যদি তোমার একই অনুভূতি থাকে।'

'ভালো করেই জানো, আমার অনুভূতির কোনো রদবদল হবে না।'

'না জাহিদ। তুচ্ছ কারণেও মানুষের স্বপ্ন, আশা ভেঙে যায়। তাছাড়া তুমি আমার সম্পর্কে কিছুই জানো না।'

'তোমার ঢাকার ঠিকানাটাও আমার জানা নেই।'

'জয়দেবপুরে আমার বাড়ি। দাদার বাড়ি। বিরাট এবং খুবই সুন্দর। ঠিক দুর্গের মতো দেখায়। ওটার ছাদে আছে অনেকগুলো ছোটো ছোটো গম্বুজ। দাদু সেগুলোর নাম

রেখেছেন তিন মিনার। আমাদের গোটা পরিবারটাই ওখানে থাকে।'

ওর মুখে দুষ্ট হাসি দেখে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'খুব বড়ো পরিবার বুঝি?'

'খু-উ-ব। বাবা-মা, ভাই-বোন, চাচা-চাচী, দাদু-দাদী আর দাদীর বোন। এছাড়া এক গাদা চাকর-বাকরও সেখানে দেখতে পাবে।'

চেঁচিয়ে উঠেছিলাম, 'বাপরে বাপ্!'

লীনা হেসে বলেছিলো, 'দাদুই হচ্ছেন বাড়ির কর্তা। সবাইকে খুব ভালোবাসেন আর সবাই তাঁর কথা মতো চলে। প্রায় আশি বছর বয়স দাদুর। লম্বায় পাঁচ ফুটের বেশি হবেন না, অর্থাৎ তার মাথাটা তোমার কাঁধ পর্যন্ত পৌছবে; অথচ খুব কম লোকই তার চোখে চোখ রেখে কথা বলতে সাহস পায়।'

একটু থেমে সে আবার বলেছিলো, 'আমার দাদুর নাম মোবারক চৌধুরী। হয়তো নাম শুনে থাকবে। কোটিপতি।'

ব্যঙ্গ করে বলেছিলাম, 'যুদ্ধের পর কে কোটিপতি থাকবে আর কে পথের ভিখারী হবে, খোদাই জানেন।'

লীনা জোর দিয়ে বলেছিলো, 'আমার দাদু যেমন আছেন, তেমনি থাকবেন। স্বয়ং যমদূতও তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। ভাবছি, তাকে তোমার পছন্দ হবে কি না?'

'তুমি পছন্দ করো?'

একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে লীনা বলেছিলো, 'আমার প্রিয়জনদের মধ্যে তিনিই হচ্ছেন সবচেয়ে বেশি প্রিয়।'

দুই

সাত বছর পর আজ দেশে ফিরেছি। লীনা ফিরেছে দু'বছর আগে। এই দু'বছরে আমাদের মধ্যে তেমন কোনো যোগাযোগ ঘটেনি বললেই চলে। তবে তার প্রতি আমার আকর্ষণ বিন্দুমাত্রও কমেনি। ও দেশে চলে যাবার পর নিজেকে খুব অসহায় আর নিঃসঙ্গ মনে হতো। মাঝে মাঝে এই ভেবে শঙ্কিত হতাম যে, লীনা হয়তো আমাকে ভুলে গেছে। এতোদিনে হয়তো বিয়ে-থা করে সংসারও পেতেছে। তবু মনে আশা নিয়ে দেশে ফিরলাম। ঢাকায় পৌঁছেই প্রথমে তার কাছে জয়দেবপুরে একটি টেলিগ্রাম পাঠালাম। লিখলামঃ

'ঢাকায় এসে গেছি। আগামীকাল রাত ন'টায় হোটেল তাজমহলে তোমার অপেক্ষায় থাকবো।'

—জাহিদ।

টেলিগ্রামটা পাঠিয়ে বাসায় গেলাম। বর্তমানে বাবা ছাড়া আপনজন বলতে আমার আর কেউ নেই। বাসায় গিয়ে

বাবাকে পেলাম না। আমাদের পুরনো চাকর আব্দুল জানালো, বাবা জরুরী কাজে ঢাকার বাইরে গেছেন। ফিরতে হয়তো দু'দিন দেরি হবে। হাত-মুখ ধুয়ে খবরের কাগজটা নিয়ে ড্রয়িং রুমে এসে বসলাম। দেশের অনেক খবরই আমার অজানা ছিলো। প্রতিটি পৃষ্ঠা উল্টেপাল্টে দেখলাম। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম, বোল্ড্ টাইপের একটা বক্স্-আইটেম আমার দৃষ্টি কেড়ে নিলো।

শোক সংবাদ

বিশিষ্ট শিল্পপতি মোবারক চৌধুরীর মৃত্যুতে আমরা গভীর ভাবে শোকাহত। আমরা মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি এবং তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করছি।

—চৌধুরী ইণ্ডাস্ট্রিজ-এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

দুঃসংবাদটা পড়ে সঙ্গে সঙ্গে পোস্ট অফিসে গিয়ে লীনাকে আরেকটি টেলিগ্রাম পাঠালাম। লিখলামঃ

'কিছুক্ষণ আগে তোমার দাদুর মৃত্যু-সংবাদ জানলাম। আমি শোকাহত। এ অবস্থায় তুমি কি আর আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবে?'

—জাহিদ।

পরের দিন দুপুরে লীনার টেলিগ্রাম পেলাম। তাতে লেখা ছিলো, সে যথাসময়েই হোটেল তাজমহলে হাজির হবে।

আবার লীনার দেখা পাবো, শুধুমাত্র এই চিন্তাটা আমাকে ভীষণ ভাবে অস্থির করে তুলেছিলো। ঠিক সাড়ে আটটায় হোটেল তাজমহলে উপস্থিত হলাম আমি। লীনা পৌঁছুলো ন'টা বিশে। এতোদিন পর তাকে দেখে আমার মনের মধ্যে যে কি প্রচণ্ড তোলপাড় শুরু হয়েছিলো, তা বুঝিয়ে বলা দুষ্কর।

এটুকুই শুধু বলতে পারি যে ওকে দেখামাত্রই আমার হার্ট বিট দশগুণ বেড়ে গিয়েছিলো। ওর মধ্যে কিন্তু তেমন কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম না আমি। তবে ওর মুখটা বেশ বিষণ্ন মনে হলো। সেখানে প্রসাধনীর চিহ্নমাত্র নেই।

ডিনারের অর্ডার দিলাম। লণ্ডন সম্পর্কে আমাকে ও অনেক প্রশ্ন করলো। অপ্রয়োজনীয় অনেক বিষয়েই কথা হলো আমাদের। যখন ওর দাদুর মৃত্যুর প্রসঙ্গ তুললাম, ও বললো, এটা ছিলো অপ্রত্যাশিত। মনে হলো, এ ব্যাপারে সে আর কিছু বলতে চাইছে না। আমিও চাপাচাপি করলাম না। ঠিক আগেকার সেই দিনগুলোর মতো, ওর সাহচর্যের প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করতে লাগলাম। ডিনার শেষ করে আমরা দু'জন পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। আমার মনের মধ্যে একটি প্রশ্ন জেগে উঠলো, যা মুখে উচ্চারণ করতে ভয় পাচ্ছিলাম। আর ওর চোখজোড়া যেন শব্দহীন ভাষায় বলছিলো, প্রশ্নটা তার জানা, কিন্তু উত্তরটা জানা নেই।

অবশেষে আমি মৃদু গলায় ডাকলাম, 'লীনা!'

'বলো,' তার মুখের সেই চিরচেনা মিষ্টি হাসিটা

আমাকে যেন আশ্বস্ত করলো।

'আমরা কবে বিয়ে করছি লীনা?' জানতে চাইলাম আমি।

মুখের হাসিটা একটু ম্লান হয়ে এলেও সে আমার হাত ধরে থাকলো। বললো, 'জানি না, জাহিদ। তাছাড়া সেটা এ মুহূর্তে আর সম্ভব নাও হতে পারে।'

ভীষণ রকমের নাড়া খেলাম। তবু মুখে সে ভাব প্রকাশ করলাম না। বললাম, 'কেন? লীনা। কেন তুমি একথা বলছো। তুমি কি আমাকে আর আগের মতো ভালোবাসো না? অন্য কেউ—!'

লীনা ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো। বললো, 'না, ঠিক তা নয়!' ও আরো কিছু বলবে, এ আশায় চুপ করে বসে থাকলাম আমি। অনেকক্ষণ পর লীনা বললো, 'কারণটা, দাদুর মৃত্যু।'

'বুঝলাম না। আমাদের বিয়ের সঙ্গে এর কি সম্পর্ক? তুমি যদি টাকা পয়সার কথা বোঝাতে চাও, তাহলে...'

আমার মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে লীনা বললো, 'না। আমি ভালো করেই জানি, টাকা-কড়িতে তোমার কোনো লোভ নেই। তাছাড়া দাদুর সম্পত্তিটা তো ঠিকই আছে। ওটার কোনো ক্ষতি হয়নি।'

'তবে...?'

অনেকক্ষণ চুপ থেকে লীনা বললো, 'দাদুর মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয়। আমার মনে হয় তাকে খুন করা হয়েছে।'

'এমন ভাবার কারণ?'

'শুধু আমি একাই এরকম ভাবছি না। খোদ্ ডাক্তারও ডেথ্-সার্টিফিকেটে সই করতে নারাজ এবং দু'এক দিনের মধ্যে লাশ কাটা হবে।'

কোনো তর্ক করলাম না। লীনার বুদ্ধির ওপর আমার সবসময় আস্থা ছিলো, এখনও আছে। সে যা বলে, বুঝে শুনেই বলে। বললাম, "কিন্তু আমাদের বিয়ে হতে বাধা কোথায়?'

'একটু চিন্তা করে দেখো, নিজেই বুঝতে পারবে। তুমি এখন গুরুত্বপূর্ণ একটি চাকরি করছো। তাছাড়া তোমাদের পরিবারটাও কম খান্দানী নয়। আমি চাই না, তুমি কোনো দুর্নামের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ো। প্লীজ, জাহিদ, কিছু বলো না! আজ ভদ্রতার খাতিরে তুমি হয়তো আমার এ যুক্তি উড়িয়ে দেবে। ব্যাপারটা হয়তো তুমি মানতে চাইবে না; কিন্তু লোকজনের কথা আমার একেবারেই সহ্য হয় না। যাই হোক, ব্যাপারটা কোনো রকম ঝামেলা ছাড়াও মিটে যেতে পারে।'

'মানে, ডাক্তারের কি কোনো ভুল হয়েছে?'

'না। ডাক্তাররা সচরাচর—এরকম ভুল করে না। আমি বলতে চাই, খুনী যদি পরিবারের বাইরের কেউ হয়, তবে কোনো চিন্তা নেই।'

কথাগুলো আমার কাছে কেমন হেঁয়ালির মতোই মনে হলো। আর লীনাও যেন তা বুঝতে পারলো। বললো, 'জানি, তুমি অনেক কিছু জানতে চাও; কিন্তু এর চেয়ে বেশি কিছু

বলা আমার পক্ষে ঠিক হবে না। হয়তো এর মধ্যেই একটু বেশি বলে ফেলেছি। দাদুর মৃত্যুরহস্যের ইতি না ঘটা পর্যন্ত আমাদের বিয়ের ব্যাপারে কোনো রকম কথাবার্তা না হওয়াই বোধহয় ভালো, শুধু এইটুকু বলার জন্যই আজ এসেছিলাম।'

'আর কোনো ব্যাখ্যা দেবে না?'

'না, জাহিদ। আমি চাই না, তুমি আমার দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করো। আমি চাই, তুমি একজন অপরিচিত ব্যক্তি হিসাবে আমাদের পরিবারটাকে দেখো।'

'কিন্তু কিভাবে?'

'তোমার বাবাই তোমাকে সব জানাবেন।'

মনে পড়লো। আমার বাবা যে সি. আই. ডি.র একজন বড়ো মাপের কর্মকর্তা এ কথাটা লণ্ডনেই একবার লীনাকে বলেছিলাম। বাবা এখনো সেই পোস্টে আছেন। ঘাবড়ে গেলাম, 'ব্যাপারটা এতোই সিরিয়াস?'

'বোধহয়। দরজার পাশে লোকটাকে দেখতে পাচ্ছো? মনে হয় পুলিসের লোক!'

'কিভাবে বুঝলে?'

'জয়দেবপুরে একে দেখেছিলাম।'

'তোমাকে ফলো করছে?'

'হ্যাঁ। আমাদের সবার উপরেই নজর রাখা হচ্ছে। একজন পুলিস ইন্সপেক্টর সতর্ক করে দিয়েছিলেন, আমরা যেন বাড়ি ছেড়ে বের না হই। তবু আমি রিস্ক নিলাম। পানির

পাইপ বেয়ে নিচে নেমেছিলাম। ভেবেছিলাম কেউ দেখেনি।'

'আচ্ছা গেছো-মেয়ে দেখছি,' আমি বললাম। 'কী সাঙঘাতিক।'

মৃদু হেসে লীনা বললো, 'কিন্তু পুলিস ঠিকই দেখেছে। তোমার টেলিগ্রামটাও নিশ্চয় পড়েছে ওরা। যাই হোক, আমার কথা শোনো। এখন থেকে আমরা দু'জনে আলাদা ভাবে কাজ করবো। আমাদের মধ্যে বেশি দেখা সাক্ষাৎ না হওয়াই ভালো।'

ওকে আশ্বস্ত করতে চাইলাম আমি, বললাম, 'শোনো লীনা, মুক্তিযুদ্ধের সময় তুমি এখানে ছিলে। যুদ্ধের বিভীষিকা তুমি দেখেছো, অথচ ঘাবড়ে যাওনি। আর এখন এক বৃদ্ধের মৃত্যুতে তুমি কেন এতোটা ভেঙে পড়ছো। বুঝতে পারছি না। ভালো কথা, ওঁর বয়েস কতো ছিলো?'

'পঁচাত্তর।'

'অর্থাৎ বার্ধক্যের কারণেও তার মৃত্যু হতে পারে। আমার মনে হয়, ডাক্তারই ভুল করেছে।'

একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে লীনা বললো, 'দাদুকে যদি কখনো তোমার দেখার সৌভাগ্য হতো, তাহলে এমন কথা বলতে না।'

তিন

ছোটোবেলা থেকেই বাবার মার্ডার কেসগুলোর প্রতি আমি একটু বেশি আগ্রহ দেখাতাম। তবে কখনো ভাবিনি একদিন আমি নিজেই কেসগুলোর একটির সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে জড়িয়ে পড়বো! বাসায় ফিরলে আব্দুল জানালো, বাবা কিছুক্ষণ আগে ফিরেছেন এবং তার অফিস রুমে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। অফিস রুমে ঢুকে দেখি বাবা একটি মোটা ফাইলের মধ্যে ডুবে আছেন। প্রায় চার বছর আগে লণ্ডনে বাবাকে শেষবার দেখেছিলাম। ঠিক তেমনিই আছেন, শুধু চুলগুলোই এবার বুঝি পুরোপুরি সাদা হতে চললো। আমাকে দেখে বাবা বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর মাত্র চারটি শব্দ উচ্চারণ করলেন, 'জাহিদ! কতো দিন পর!'

বাবার স্বভাব বরাবরই এমন। খুব কম কথা বললেন। তবু তার ওই চারটি শব্দের মধ্য দিয়ে আমার প্রতি তার গভীর ভালোবাসা ও স্নেহ ফুটে উঠলো। একটা চেয়ার টেনে বসলাম। বাবা বললেন, 'তোমাকে গতকাল রিসিভ করতে

পারিনি বলে আমি সত্যি দুঃখিত জাহিদ। ইদানীং কাজের চাপ একটু বেড়েছে। তাছাড়া, এই তো গতকালই হাতে একটা জটিল কেস পেলাম।'

সরাসরি অ্যাটাক করলাম, 'মোবারক চৌধুরীর হত্যারহস্যের কথা বলছো?'

বাবার চোখ দুটো একটু বিস্ফারিত হলো, বললেন, 'তুমি কিভাবে জানলে?'

'আমার অনুমান তাহলে মিথ্যে নয়।'

আবার প্রশ্ন, 'কিভাবে জানলে?'

বাবাকে ধাঁধায় ফেলে ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করতে লাগলাম, 'বিশ্বস্ত সূত্রের কাছ থেকে।'

'বিশ্বস্ত সূত্রটি কে?'

'শুনে হয়তো তুমি খুশি হবে না, তবু বলছি। লীনা চৌধুরী। অর্থাৎ মোবারক চৌধুরীর নাতনী। তার সঙ্গে লণ্ডনে চার বছর আগে আমার পরিচয় হয়। আমরা একসঙ্গে অক্সফোর্ডে পড়তাম।'

একটু ইতস্ততঃ করে বললাম, 'বাবা, লীনাকে আমি ভালোবাসি। ওকে বিয়ে করতে চাই। আজ রাতেই আমাদের দেখা হয়েছে। আমাকে তার দাদুর ব্যাপারটা তখনই সে জানায়।'

বাবা বিস্মিত হয়ে বললেন, 'দেখা হয়েছিলো? কিভাবে? আমরা তো ওদের অনুরোধ করেছিলাম, কেউ যেন বাড়ি ছেড়ে কোথাও না যায়। ওদের ওপর পুলিসও কড়া নজর

রেখেছে।'

'জানি। আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য লীনা পানির পাইপ বেয়ে নিচে নেমেছিলো।'

বাবার মুখে মুচকি হাসি দেখা গেল, 'মেয়েটির সাহস আছে বলতে হয়।'

'হ্যাঁ। কিন্তু পুলিসও সজাগ দৃষ্টি রাখে। এবং তোমারই এক লোক হোটেল তাজমহলে আমাদের ওপর নজর রেখেছিলো। তোমার কাছে তার লিখিত রিপোর্টে লোকটা নিশ্চয় আমার কথা উল্লেখ করে লিখবে, লীনা চৌধুরী বাড়ি থেকে পালিয়ে প্রায় ছ'ফুট লম্বা, হ্যাণ্ডসাম, কালো চুলের অধিকারি এবং অ্যাশ কালারের স্যুট পরা এক যুবকের সাথে দেখা করেছিলো।'

বাবা পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'জাহিদ, তুমি কি মেয়েটিকে বিয়ে করার ব্যাপারে সিরিয়াস?'

'নিশ্চয়, বাবা।'

বাবাকে খুব চিন্তিত মনে হলো। বললাম, 'বাবা, এই বিয়ের ব্যাপারে তোমার কোনো আপত্তি আছে?'

'এক সপ্তাহ আগে খবরটা শুনলে কোনো অমত করতাম না। ভালো ফ্যামিলি, তাছাড়া মেয়েটি অনেক সম্পত্তি পাচ্ছে। কিন্তু এখন পরিস্থিতি পাল্টে গেছে।'

'কেন? তার দাদু খুন হয়েছে বলে?'

'হ্যাঁ। তবু তোমাদের বিয়েতে আমি কোনো অমত

করবো না, যদি…।'

'যদি…?'

'যদি প্রমাণ করা যায় খুনী ওর পরিবারের কেউ নয়।'

ধীরে ধীরে আমার কৌতূহল বাড়ছে। এনিয়ে আজ রাতে বাক্যটি দুবার শুনলাম। বাবাকে বললাম, 'বাবা, একটু ব্যাখ্যা করে বলো না, প্লীজ।'

'এই কেসটি সম্পর্কে কতোটুকু জানো?'

'তেমন কিছু না।'

'মেয়েটি তোমাকে কিছু বলেনি?'

'না। ওর অভিমত, একজন অপরিচিত লোক হিসাবেই এই কেসটা আমার দেখা উচিত।'

বাবা কিছু বললেন না। চেয়ার থেকে উঠে কিছুক্ষণ পায়চারি করলেন। তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, 'পরিবারটি সম্পর্কে কি জানো?'

'তেমন কিছু না। শুধু এইটুকু জানি, মোবারক চৌধুরী তাঁর ছেলেদের এবং তাঁদের পরিবারের সবাইকে নিয়ে একই বাড়িতে বাস করতেন। এছাড়া কিছুই না। তুমিই বরং ওদের সম্পর্কে আমাকে বলো।'

বাবা আবার তাঁর চেয়ারে গিয়ে বসলেন। বললেন, 'ঠিক আছে। তাহলে প্রথম থেকে শুরু করা যাক। মোবারক চৌধুরী তাঁর গ্রামের বাড়ি ছেড়ে যখন ঢাকায় আসেন তাঁর বয়স তখন মাত্র চব্বিশ বছর…' হঠাৎ বাধা পড়লো শুরুতেই।

আব্দুল এসে জানালো, ইন্সপেক্টর মাহবুব বাবার সঙ্গে

দেখা করতে চান। বাবা তাঁকে নিয়ে আসতে বললেন। আমাকে বললেন, 'মাহবুবের ওপর কেসটার তদন্ত ভার পড়েছে। খুব ঝানু লোক। পরিবারটা সম্পর্কে আমার চেয়ে বেশি জানে।'

ইন্সপেক্টর মাহবুব ঘরে ঢুকলে বাবা তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। ভদ্রলোককে আমার ভালোই লাগলো। বেশ সদালাপী মানুষ। কেতাদুরস্তও। বাবা তাকে বসতে বললেন, 'জাহিদকে মোবারক চৌধুরী সম্পর্কে কিছু তথ্য দিচ্ছিলাম। কোনো ভুল হলে ঠিক করে দিও…।'

আমার দিকে ফিরে আবার শুরু করলেন, 'প্রায় ষাট বছর আগে মোবারক চৌধুরী ঢাকায় এসে কমলাপুরের এক ছোট্ট গলিতে একটা চায়ের দোকান খুলে ব্যবসা শুরু করেন। সেটা ছিলো শুরু মাত্র। এরপর শহরের নানা জায়গায় তিনি বেশ কয়েকটি হোটেল ও রেস্তোরাঁ চালু করেন। এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে ঢাকা শহরের রাঘব-বোয়ালদের একজন বনে যান।'

মাহবুব বললেন, 'খুব চতুর লোক ছিলেন। জীবনে কখনো কেউ তাঁকে ঠকাতে পারেনি এবং নিজে কখনো কোনো ব্যবসার ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করেননি।'

বাবা বলে গেলেন, 'হোটেল রেস্তোরাঁ চালানোর পাশাপাশি তিনি আমদানী-রফতানির ব্যবসায়েও নেমে পড়লেন।'

মাহবুব যোগ করলেন, 'নানা ধরনের ব্যবসার সঙ্গেই উনি জড়িত ছিলেন। চৌধুরী ইণ্ডাস্ট্রিজের প্রতিষ্ঠা করেন—বেশ দক্ষতার সঙ্গে। এবং ওই ইণ্ডাস্ট্রির বদৌলতেই টাকার কুমির বনে যান।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'উনি কি ব্যবসার ক্ষেত্রে কোনো রকম কারচুপি করতেন?'

ইন্সপেক্টর মাথা নাড়লেন, 'ঠিক জানি না। তবে, কখনো এমন কিছু করেননি বা এমন কোনো ব্যবসাতে হাত দেননি যা তাঁর জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারে। যখনই বুঝতেন ব্যবসাটা তাঁকে ডোবাতে পারে, সেটা ছেড়ে অন্য কাজে হাত দিতেন। যে ধরনের ব্যবসাই হোক, সেটা থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফা করে ছেড়েছেন উনি।'

বললাম, 'মনে হচ্ছে লোকটা একটা জিনিয়াস ছিলো।'

বাবা বললেন, 'ঠিক তাই। আশ্চর্য এক চরিত্র। বেঁটে খাটো একটা লোক; কিন্তু অটুট ব্যক্তিত্ব ছিলো তাঁর। যে একবার তাঁর সঙ্গে কথা বলতো, সে-ই ভক্ত হয়ে পড়তো। বিশেষ করে মেয়েরা। মেয়েদের মন জয় করবার ব্যাপারে তাঁর অদ্ভুত ক্ষমতা ছিলো। তাঁর স্ত্রী ছিলেন এক বিখ্যাত বস্ত্র ব্যবসায়ীর কন্যা।'

'নিশ্চয় ব্যবসার খাতিরে তাঁদের বিয়ে হয়।'

'মোটেও না। ব্যাপারটা ছিলো বিশুদ্ধ লাভ-ম্যারেজ। ভদ্রমহিলা মোবারক চৌধুরীর জন্য বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যান। তাঁর বাবা-মার এ বিয়েতে একদম মত ছিলো না।'

'ওদের দাম্পত্য-জীবন কি সুখের ছিলো?'

'হ্যাঁ, বিয়ের পরই তাঁরা আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ছেড়ে জয়দেবপুরে তাঁদের প্রাসাদোপম বাসভবন নির্মাণ করলেন। এবং অনেকগুলো সন্তানের বাবা-মা হলেন।'

'ঠিক রূপকথার মতো।'

বাবা বলে গেলেন, 'মোবারক খুবই ভাগ্যবান ছিলেন। জয়দেবপুরের অদূরে একটি সুন্দর জমিতে তিনি প্রাসাদ তৈরি করেছিলেন। জায়গাটা তখন একেবারেই খালি ছিলো, এখনো আশেপাশে তেমন কোনো ঘরবাড়ি নেই। দূর থেকে বাড়িটাকে ঠিক দুর্গের মতো দেখায়! তিন মিনারে চৌধুরী দম্পতির দিন-কাল সুখে-শান্তিতে কাটতে লাগলো। তবে কিছু দিনের মধ্যেই পরিবারটির ওপর নেমে এলো দুঃখের কালো ছায়া। মিসেস চৌধুরী হৃদরোগে আক্রান্ত হন এবং কিছুদিনের মধ্যেই তিনি মারা যান। চৌধুরী সাহেবের তখন মাত্র চুয়াল্লিশ বছর বয়েস।'

'তখন ওদের ক'টা ছেলেমেয়ে?'

'ছয়জন। এক ছেলে ছোটো বেলায় নিউমোনিয়ায় মারা যায়। দুই ছেলে সড়ক-দুর্ঘটনায় এক সঙ্গে প্রাণ হারায়। তারা দুজনেই অবিবাহিত ছিলো। এক মেয়ে বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ায় চলে যায় এবং সেখানেই দশ বছর আগে মৃত্যুবরণ করে। আরেক মেয়ে মারা যায় কঠিন অসুখে। জীবিতদের মধ্যে আছে বড়ো ছেলে রউফ চৌধুরী। সে বিবাহিত; কিন্তু নিঃসন্তান। মেঝো ছেলে রহমান চৌধুরী,

তার স্ত্রী মাজেদা চৌধুরী বিখ্যাত এক নাট্যাভিনেত্রী। তাদের তিন সন্তান, লীনা, মাসুদ আর টিনা।'

বাবা দম নেবার জন্য থেমে গেলেন। আমি প্রশ্ন করলাম, এরা সবাই কি তিন মিনারে থাকে?'

'হ্যাঁ। রউফ চৌধুরী স্ত্রীকে নিয়ে মালিবাগে থাকতো; কিন্তু কিছুদিন পর বাপের বাড়িতে চলে যায় এবং সেখানেই থেকে যায়। এছাড়া তিন মিনারে আরো একজন বাসিন্দা আছে, মিসেস চৌধুরীর ছোটো বোন হাসিনা বেগম। হাসিনা বেগম অবিবাহিত এক বৃদ্ধা। বোনের মৃত্যুর পর ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা করার জন্য মোবারকের অনুরোধে সে তিন মিনারে চলে আসে এবং সেখানেই থেকে যায়।'

মাহবুব বললেন, 'ছেলেমেয়েদের সবাইকে সে খুবই ভালোবাসে এবং এতোগুলো বছর সে-ই তাদের দেখাশোনা করেছে; কিন্তু মোবারক চৌধুরীকে সে কখনো পছন্দ করতো না।'

বললাম, 'অর্থাৎ তিন মিনার লোকজনে ভর্তি। তা, খুনী হিসেবে আপনি কাকে সন্দেহ করেন?'

মাহবুব মাথা নেড়ে, মুচকি হাসি হেসে বললেন, 'এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না। না জেনে কিছু বলা ঠিকও হবে না।'

'আমার মন বলছে, আপনি জানেন। বলে ফেলুন, আমরা তো আর কোর্টে বসিনি।'

'তা ঠিক। হয়তো কোর্টে যাবার আদৌ প্রয়োজনই হবে না।'

'তাহলে কি বলতে চান, মোবারক চৌধুরী আসলে খুন হয়নি?'

'না। খুন সে ঠিকই হয়েছে। তাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে অকাট্য প্রমাণ পাওয়া কঠিন। যদিও আমরা হত্যার অনেকগুলো মোটিভ খুঁজে পেয়েছি।'

টেবিলে একটা কিল মেরে বললাম, 'অর্থাৎ খুনীকে আপনি জানেন।'

কিন্তু মাহবুব সহজে মুখ খুলতে চাইলেন না, বললেন, 'আমি বলেছি মোটিভ পাওয়া গেছে, কিন্তু কোনো প্রমাণ আমাদের হাতে নেই।'

বাবার দিকে অসহায় ভঙ্গিতে তাকালাম। বাবা মুচকি হেসে বললেন, 'তোমার দুরবস্থা ফীল করতে পারছি, মাই বয়।'

লম্বা একটা দম নিয়ে বাবা বললেন, 'জাহিদ, তুমি হয়তো জানো না, মাত্র দশ বছর আগে মোবারক চৌধুরী আরেকটি বিয়ে করেছিলেন।'

'পঁচাত্তর বছর বয়সে?' তাজ্জব হয়ে গেলাম।

'হ্যাঁ, এবং তার দ্বিতীয় স্ত্রীর বয়স তখন মাত্র চব্বিশ বছর।'

তথ্যটা আমাকে আরো কৌতূহলী করে তুললো। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ধরনের মেয়ে?'

'ভদ্র, মার্জিত এবং অত্যন্ত সুন্দরী। মোবারকের এক হোটেলে ওয়েট্রেসের কাজ করতো।'

'তাকেই কি সবচেয়ে বেশি সন্দেহ করা হচ্ছে?'

'নিশ্চয়। তার বর্তমান বয়স চৌত্রিশ। এটি মেয়েদের একটি মারাত্মক বয়স। ভীষণ রকমের খরচ করে এবং টাকাই হচ্ছে তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। তাছাড়া বাড়িতে সুদর্শন এক যুবকের আনাগোনা লেগেই আছে। রহমান চৌধুরীর ছোটো দুই ছেলেমেয়েকে সে প্রাইভেট পড়ায়। ওর হার্ট নাকি খুবই দুর্বল।'

'হত্যার জন্য কি ধরনের বিষ ব্যবহার করা হয়?'

'এখনো সঠিক জানা যায়নি। ডাক্তারের রিপোর্ট এখনো পাইনি। তবে সম্ভবত আইজেরিন ব্যবহার করা হয়েছিলো।'

'আইজেরিন! ওটা তো মারাত্মক এক ওষুধ। আর খুব কম লোকই ওটা ব্যবহার করে থাকে। আমার মনে হয় খুনী কে তা সহজে জানা যাবে।'

মাহবুব আফসোস করার ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বললেন, 'বরং উল্টোটা বলুন। মোবারক চৌধুরী নিজেই চোখের ওষুধ হিসাবে আইজেরিন ব্যবহার করতেন। প্রতিদিন তিনি দু'চোখে দু'ফোঁটা করে দিতেন ওই ওষুধটা।'

বাবা আমার দিকে ঝুঁকে বললেন, 'মি. চৌধুরী ডায়বেটিসে ভুগতেন। প্রতিদিন ইনস্যুলিন ইনজেকশন নিতেন। কিছু বুঝলেন?'

'আলবত। হত্যার দিন ইনস্যুলিনের বদলে সিরিঞ্জে আইজেরিন ভরা হয়। তাই না?'

'এক্জাক্টলি।'

'চৌধুরী সাহেব কি নিজে ইনজেকশন নিতেন?'

'না। তাঁর যুবতী স্ত্রী রত্নার ওপর ওই কাজের ভার ছিলো।'

প্রশ্ন করলাম, 'রত্নার সঙ্গে পরিবারের অন্য লোকদের সম্পর্ক কেমন?'

'খারাপ। প্রয়োজন ছাড়া তার সাথে কেউ কথা বলে না। রত্না প্রাসাদের দ্বিতীয় তলায় সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে বসবাস করছে।'

পুরো ব্যাপারটাই এখন আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। রত্না চৌধুরীকে খুনী হিসাবে সাব্যস্ত করার পেছনে অনেক যুক্তি আছে। তবু মনে হলো মাহবুব কোনো এক ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত। তাঁকে বললাম, 'মনে হচ্ছে, কোনো ব্যাপারে আপনি চিন্তিত।'

'ঠিকই ধরেছেন। একটি ব্যাপারে খটকা লাগছে। রত্নাই যদি খুনী হয়ে থাকে, তবে আইজেরিনের শিশিটা লুকিয়ে ফেললো না কেন? সিরিঞ্জটাই বা ধুইয়ে মুছে রাখলো না কি জন্যে? যদি তা করতো, তাহলে ডাক্তারের পক্ষে সন্দেহ করা সম্ভব হতো না। কারণ, মৃত ব্যক্তির শরীরে আইজেরিন কোনো চিহ্ন রাখে না। সিরিঞ্জটা চেক করতে গিয়ে ডাক্তারের মনে সন্দেহ জাগে। তিনি মনে করেছিলেন, ভুলক্রমে হয়তো ইনস্যুলিনের পরিমাণ বেশি হয়ে গিয়েছিলো; ফলে মৃত্যু ঘটে। কিন্তু সিরিঞ্জ চেক করে তিনি দেখেন, ইনস্যুলিন নয়, ওটায় আইজেরিন ছিলো।'

বললাম, 'হয় রত্না চৌধুরী খুবই বোকা নতুবা খুবই চতুর মহিলা।'

'মানে...?'

উত্তরটা আমারও জানা ছিলো না, তাই আরেকটা প্রশ্ন করে বসলাম, 'রত্না ছাড়া আর কাকে সন্দেহ করছেন?'

এবার উত্তর দিলেন বাবা, 'আমরা সবাইকে সন্দেহ করছি। মোবারক চৌধুরীর পার্সোনাল বাথরুমের একটি কাঠের আলমারিতে নানারকম ওষুধপত্র রাখা হয়। ইনস্যুলিনের শিশিটা খালি করে ওতে আইজেরিন ভরে রাখা বাড়ির যেকারো পক্ষে সম্ভব।'

মাহবুব যোগ করলেন, 'তাছাড়া সেই আলমারিটা সবার ব্যবহারের জন্য দিনরাত খোলা থাকে।'

'আর মোটিভ?'

উত্তর দেবার আগে বাবা তাঁর সিগারের কেস খুলে একটি সিগার মাহবুবকে দিয়ে নিজেও একটি নিয়ে ঠোঁটে গুঁজলেন। ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'মোবারক চৌধুরী কোটিপতি ছিলেন। যদিও তিনি তাঁর ছেলেদের যথেষ্ট টাকা পয়সা দিচ্ছিলেন; তবু কি এমন হতে পারে না, যে কেউ একজন আরো বেশি চেয়েছিলো? লোভ একটি মারাত্মক মোটিভ, মাই বয়।'

'আর সেই মাস্টার? তার আর্থিক অবস্থা কেমন?'

মাহবুব বললেন, 'একেবারে ফতুর।'

মাহবুবকে জিজ্ঞেস করলাম, 'রত্না সম্পর্কে আপনার ব্যক্তিগত ধারণা কি?'

ইন্সপেক্টর কেশে গলাটা পরিষ্কার করলেন, 'এই ধরনের মেয়েদের বোঝা কঠিন। খুব শান্ত, কোনো ভাবাবেগ নেই। তার মাথায় কি ধরনের চিন্তা চলছে আঁচ করাও মুশকিল। শুধু এতোটুকু বলতে পারি, বিলাসবহুল জীবনই হচ্ছে তার একমাত্র কাম্য। মোবারক চৌধুরী তার জন্য সেই আরামদায়ক জীবন-যাপনের ব্যবস্থাই করেছিলেন। তার বিরুদ্ধে আমাদের কাছে কোনো প্রমাণ নেই।'

পরিষ্কার বুঝতে পারলাম। পুলিসের হাতে কারো বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ নেই। হয়তো আদৌ কোনো প্রমাণ পাবে না। ফলে খুনীও ধরা ছোঁয়ার বাইরেই থেকে যাবে। শুধুমাত্র সন্দেহজনক কোনো কিছুর ভিত্তিতে পুলিস কাউকে গ্রেফতার করবে না।

এর অর্থ মোটিভের পাশাপাশি অকাট্য প্রমাণও আমাদের হাতে থাকা দরকার। লীনা সেই প্রমাণ চায়, মাহবুব চায়, আমিও চাই। লীনা বলেছে খুনী যদি তার পরিবারের কেউ না হয়ে থাকে, তাহলে কোনো সমস্যা থাকবে না। রত্না ধরতে গেলে ওদের রক্তমাংসের কেউ নয়। তাই খুনী যদি রত্না হয় এবং প্রমাণসহ তাকে ধরা যায়, তবে ঝামেলা চুকে যাবে। আমাদের বিয়েতে আর কোনো বাধা থাকবে না। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, এখনো লীনা, মাহবুব বা আমার হাতে কোনো প্রমাণ নেই। সমস্যাই বটে।

চার

পরদিন সকালেই আমি ইন্সপেকটর মাহবুবের সঙ্গে তিন মিনারের পথে রওনা দিলাম। এই কেসটায় আমার ভূমিকাটা কি, তা নিজের কাছেও পরিষ্কার নয়। আমি কি পুলিসকে সাহায্য করছি? না নিজের স্বার্থে কাজ করছি? তবে কেসটা যে সত্যি আমাকে কৌতূহলী করে তুলছে, তা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। গতকাল রাতে শোনা বাবার কয়েকটা কথা মনে পড়লো, তিনি বলছিলেন, 'খুনী কে, তা জানতে চাইলে, পরিবারটির ভিতরের খবর আমাদের জানতে হবে। ওদের সবার সম্পর্কে খুঁটিনাটি খবর নিতে হবে। অতীত, বর্তমান এমন কি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ওদের কার কি চিন্তা-ভাবনা; শুনতে হবে সেকথাও। আর একমাত্র তুমিই আমাদের এসব খবর সরবরাহ করতে পারবে।'

একটু ইতস্ততঃ করে বললাম, 'স্পাইগিরি করতে বলছো। তা হয় না বাবা। আমার আর লীনার সম্পর্কের সুযোগ নিয়ে তারই পরিবারের ওপর আমি গোয়েন্দাগিরি

করতে পারবো না।'

বাবা বিরক্তিসূচক ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বেকুবের মতো কথা বলো না। খুনী হিসেবে কি তুমি লীনাকেই তবে সন্দেহ করো?'

'কখ্খনো না। এ ব্যাপারে আমি একশো ভাগ নিশ্চিত।'

'তবে আর চিন্তা কি? একটি কথা মনে রেখো। যতোদিন না এই হত্যারহস্যের কিনারা হচ্ছে, অর্থাৎ যতোদিন পর্যন্ত ঐ পরিবারের প্রত্যেককে খুনী বলে সন্দেহ করা হতে থাকবে, ততোদিন পর্যন্ত ঐ মেয়েটিকে তুমি বিয়ে করতে পারবে না। আমিই তা হতে দেবো না।'

বাবা তাঁর কথা আমাকে জানালেন। কিন্তু আমার কোনো কথাই শুনতে তিনি নারাজ। একে তো সি.আই.ডি.-র লোক তার ওপর আমার বাবা। তাঁর কথা অমান্য করি কিভাবে? তাই আমি আজ তিন মিনারের পথে। নিজেকে খুব অসহায় মনে হলো। লীনা আমাকে দেখে কি ভাববে। আর আমিই বা তাকে কি বলবো?

মাহবুবের দিকে তাকালাম। নির্বিকার ভাবে তিনি আমার পাশে বসে আছেন। তাঁর কাছ থেকে সাহায্য পাবার কোনো আশা নেই। বরং তাঁকেই আমার সাহায্য করতে হবে। নিশ্চয় তিনি আমাকে টোপ হিসাবে ব্যবহার করার চিন্তা-ভাবনা করছেন। লীনা বা তার পরিবার পুলিসের কাছে যতোটুকু বলবে, বন্ধু হিসাবে আমার কাছে তারচেয়ে বেশি বলবে। কিন্তু ব্যাপারটা সে কী ভাবে নেবে! আমার

উদ্দেশ্যটা ও ঠিকই ধরে ফেলবে। এই মুহূর্তে নিজেকে একজন সস্তা দরের স্পাই ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছি না।

তিন মিনারে যখন পৌঁছলাম তখন ঘড়িতে প্রায় ন'টা বাজে। দূর থেকে বাড়িটা সত্যি সত্যি একটি দুর্গের মতোই দেখায়। গুণে গুণে এগারোটি গম্বুজ আবিষ্কার করলাম আমি। তার মধ্যে তিনটি বেশ উঁচু। মাহবুব বললেন, 'অদ্ভুত বাড়ি, তাই না? দূর থেকে দেখলেই গা-টা কেমন ছমছম করে ওঠে। তবে ভিতরের অবস্থা একদম ভিন্ন।'

উত্তর দেবার সময় পেলাম না। বাগানের একপ্রান্ত থেকে লীনাকে আমাদের দিকে হেঁটে আসতে দেখলাম। আমাকে দেখে থমকে দাঁড়ালো সে। জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি!'

তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'হ্যাঁ। তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে।'

আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলো লীনা। তারপর ইশারা করে তাকে অনুসরণ করতে বললো। বাগানটা পার হয়ে বাড়ির পেছন দিকে চলে গেলাম আমরা। বাগান না বলে একে জঙ্গলের সঙ্গে তুলনা করলেই খুব সম্ভব ভালো হয়। তবে বেশ ছিমছাম। কোথাও কোনো আগাছা নজরে পড়লো না। ছোটো বড়ো বিভিন্ন ধরনের গাছ সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। একটি বড়ো আম গাছের কাছে গিয়ে একটি কাঠের বেঞ্চ দেখিয়ে লীনা বসতে বললো, নিজেও বসে পড়লো। সবুজ রঙের সালোয়ার কামিজে লীনাকে সেই মুহূর্তে আমার কাছে ঠিক পরীর মতোই মনে হচ্ছিলো। তবে

মুখটা ম্লান, লক্ষ্য করলাম। আমার দিকে না তাকিয়ে বললো, 'বলো কি বলতে চাও!'

কণ্ঠস্বরে কোনোরকম উৎসাহের চিহ্ন পেলাম না। তবু সাহস সঞ্চয় করে কোনো কিছু না লুকিয়ে পুরো ব্যাপারটা ওকে খুলেই বললাম। মনোযোগ দিয়ে শুনলো সে। শেষ হলে একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো, 'তোমার বাবা সত্যি জ্ঞানী মানুষ।'

'আমার কিন্তু এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র মত ছিলো না।'

'না, জাহিদ। হয়তো এটাই একমাত্র উপায়। তোমার বাবার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আমার দৃষ্টিভঙ্গির অনেকটা মিলে যায়। খুনী কে, আমাদের তা জানতে হবে।'

'আমাদের খাতিরে? দেখো লীনা, খুনী যেই হোক না কেন; আমাদের সম্পর্কটা সব সময় আগের মতোই থাকবে।'

'না। শুধু আমাদের খাতিরে নয়। গতকাল তোমার কাছে অনেক কথাই চেপে গিয়েছিলাম। সত্যি বলতে কি, আমি খুব ভয় পাচ্ছি।'

'ভয়?'

'হ্যাঁ। পুলিস, তোমার বাবা, সবাই ভাবছে রত্নাই খুনটা করেছে।'

'স্বাভাবিক।'

'মনে মনে হয়তো আমিও কামনা করছি, তাই যেন হয়। কিন্তু ভালো করে চিন্তা করলে বিশ্বাস হতে চায় না।'

'তুমি কি অন্য কাউকে...?'

আমার কথা কেড়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি ও বলে উঠলো, 'জানি না। শুধু মনে হয় রত্না খুন করতে পারে না। এতোটা বোকা সে নয়।'

'আর সেই মাস্টার?'

'সাদেক? সে তো একটা খরগোশের চেয়েও ভীতু।'

'কি করে জানলে?'

'জানি না, তবে মনে হয়।' একটু থেমে যোগ করলো, 'রত্নাকে সন্দেহ করার পেছনে অনেক যুক্তি থাকলেও ঠিক মানতে পারছি না। জাঁকজমকপূর্ণ জীবন পেলেই সে সন্তুষ্ট। বড়ো বাড়ি, চাকর-বাকর, লেটেস্ট মডেলের গাড়ি, শাড়ি, অলঙ্কার এই হচ্ছে তার জীবন। এসব পেলে সে আর কিছুই চাইবে না। আর বয়সের পার্থক্য অনেক হলেও দাদুকে সে ভালোবাসতো। দাদুর কাছে সে স্বামীর আদরের পাশাপাশি পিতার স্নেহও খুঁজে পেয়েছিলো।'

'কিন্তু তুমি ভয় পাচ্ছো কেন?'

লীনা ওর কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে বললো, 'বাইরে থেকে আমাদের এই পরিবারটিকে সাধারণ মনে হলেও, আসলে আমরা মোটেও তা নই। আমাদের মধ্যে দয়ামায়া জিনিসটা কম। দরকার পড়লে এই পরিবারের লোকরা প্রচণ্ড রকম নিষ্ঠুর হতে পারে।'

আমার মুখে অবিশ্বাসের ছাপ দেখতে পেয়ে লীনা আবার বললো, 'বিশ্বাস হচ্ছে না? ঠিক আছে শোনো, দাদুর ছোটো বেলার একটা ঘটনা বলছি। গ্রামের বাড়িতে কি এক

কারণে দাদুর সঙ্গে একটি ছেলের ঝগড়া হয়। ঝগড়ার এক পর্যায়ে দাদু তাঁর ছোরা বের করে ছেলেটার পেট এফোঁড় ওফোঁড় করে দেন। দাদু এমন সহজ ভাবে ঘটনাটা আমাদের বলেছিলেন, যেন মানুষ খুন করা আর ইঁদুর মারা একই ব্যাপার। আমার দাদীর মনটাও খুব শক্ত ছিলো।'

'মানলাম, তোমার দাদু নিষ্ঠুর ছিলেন। তাই বলে তোমার বাবা, চাচা বা তোমরাও তেমন হবে, এমন কোনো কথা নেই।'

'না। আমরা সবাই একই স্বভাব পেয়েছি। আমার মা হয়তো একটু অন্যরকম; কিন্তু আমাদের মধ্যে সে-ই বেশি স্বার্থপর। আর বড়ো চাচী অসম্ভব ঠাণ্ডা স্বভাবের মহিলা। তার অনুভূতি বোঝার উপায় নেই। বড়ো চাচা এমনিতে ভালোই; কিন্তু রেগে গেলে দানব বনে যান। আর বাবা...।'

একটু থেমে যোগ করলো, 'আমার বাবা হলেও তাকে আমি কখনো বুঝতে পারি না। শুধু আমি কেন, কেউই তাকে বুঝতে পারে না।'

'তুমি বলতে চাও তোমার ফ্যামিলির প্রতিটি মানুষ খুন করতে পারে?' ব্যাপারটা আমার কাছে খুব হাস্যকর বলে মনে হচ্ছে।

'হ্যাঁ। আমিও পারি।'

'তুমি?' লীনার মুখের দিকে তাকালাম।

'হ্যাঁ আমারও মাঝে মাঝে মনে হয়, দরকার পড়লে আমিও খুন করতে পারবো।'

নিজের অজান্তে হেসে ফেললাম। লীনাও স্মিত হেসে বললো, 'পাগল ঠাউরে বোসো না আমাকে। কাউকে সন্দেহের বাইরে রাখা যাবে না। খুনী কে, আমাদের তা জানতেই হবে।'

পাঁচ

বিরাট বাড়িটার দিকে যাবার পথে দেখলাম, এক বৃদ্ধা আমাদের দিকে হেঁটে আসছেন। লীনা আমাকে ফিসফিস করে বললো, 'হাসিনা খালা আসছেন। আমার দাদীর বোন। তাঁকে আমরা সবাই হাসিনা খালা বলে ডাকি।'

হাসিনা বেগম আমাদের কাছে এসে দাঁড়ালেন। লীনা আমাদের পরিচয় করে দিলো। আন্দাজ করলাম, প্রায় সত্তরের কাছাকাছি বয়েস হবে ভদ্রমহিলার। কিন্তু শরীর এখনো মজবুত আছে। অবশ্য চুলগুলো পুরোপুরি সাদা হয়ে গেছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ আমাকে দেখলেন তিনি। তারপর বললেন, 'ভালো আছো? তোমার কথা লীনার কাছে শুনেছি। তোমার বাবাকে আমি চিনি, তোমার মাকেও চিনতাম। খুবই ভালো মানুষ ছিলেন। তুমি কি এই বিপদে আমাদের সাহায্য করতে এসেছো, না ঠিক তার উল্টোটা?'

এই আক্রমণের জন্য আমি মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। আমতা আমতা করে বললাম, 'আশা করি সাহায্য করতে

পারবো।'

'ভালো। বাড়িটায় পুলিসের লোক গিজগিজ করছে। তন্ন তন্ন করে কি যেন খুঁজছে। কী যে খুঁজছে আল্লাই জানেন। ওদের হাবভাব আমার মোটেও ভালো লাগে না।'

হঠাৎ লীনার দিকে ফিরে বললেন, 'খোদেজা তোকে খুঁজছে। তুই নাকি আজ আমাদের রান্না করে খাওয়াবি?'

লীনা চেঁচিয়ে উঠলো। 'হায় হায়, একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। আমি এক্ষুণি যাচ্ছি।' লীনা প্রায় দৌড়াতে দৌড়াতে বাড়ির দিকে চলে গেল। আমি আর হাসিনা খালা ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলাম। হাঁটতে হাঁটতেই তিনি বললেন, 'খোদেজা না থাকলে সত্যি বিপদে পড়তাম। বাড়িতে আরো ছ'জন কাজের লোক আছে, তবে ও-ই সব কাজ দেখাশোনা করে। বাবুর্চি থাকলেও রান্নার কাজ ওর বড়োই পছন্দ। অনেক বছর হলো এ বাড়িতে আছে মেয়েটা। আমার নিজের গ্রামের লোক,' হাসিনা বেগম থেমে গেলেন। দেখলাম হঠাৎ একটি ছোটো সবুজ রঙের পোকা উড়ে এসে তাঁর শাড়ির ওপর পড়লো। ওটা ধরে হাতের মুঠি বন্ধ করে উনি পোকাটাকে গুঁড়ো করে ফেললেন। তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'সত্যি বলতে কি, আমরা কখনো ভাবিনি, দুলাভাই এভাবে খুন হয়ে যাবে। পুলিস কি ভাবছে জানি না। তোমার কাছে কিছু জানতেও চাই না। কারণ তুমি পুলিসের কথা আমাদের কাছে বলবে না। ভাবতে কষ্ট হয়,

দুলাভাই আর আমাদের মাঝে নেই। মিথ্যা বলবো না, তাকে আমি কখনো পছন্দ করতাম না। তবু তার মৃত্যুর পর বাড়িটা কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে।'

মনে হলো উনি নিজের পুরানো কিছু স্মৃতিচারণ করতে চান। তাই চুপ করে তাঁর কথা শুনলাম। তিনি বলে চললেন, 'ভাবতে পারো; প্রায় চল্লিশ বছর হলো এ বাড়িতে আছি! আমার বোনের মৃত্যুর পরপরই এখানে এসেছিলাম। মোবারক চৌধুরীকে বিয়ে করে আমার বোন মারাত্মক ভুল করেছিলো, তবু তার মৃত্যুর পর তার ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা করার জন্য না এসে থাকতেও পারিনি। দুলাভাই অবশ্য আমার সাথে খুব ভালো ব্যবহার করতেন। সংসারটা মনের মতো করে চালানোর সব রকম স্বাধীনতা তিনি আমাকে দিয়েছিলেন। ছেলেদের আমি ভালো ভালো স্কুলে ভর্তি করালাম, ওদের জন্য ভালো মাস্টার ঠিক করলাম। আর এখন ওদেরই ছেলে মেয়েদের দায়িত্বও আবার স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নিয়েছি।' দম নেবার জন্য হাসিনা খালা থামলেন।

আমি বললাম, 'কখনো নিজের বাড়িতে ফিরে যেতে মন চায়নি।'

'না। এখনো চায় না। তবে প্রথম দিকে ঘন ঘন যেতাম। একসময় ঠিক করেছিলাম, ছেলেমেয়েরা বড়ো হলে চলে যাবো। থেকে গেলাম শুধু এই বাগানটার জন্য। এই বাগানটাই এখন আমার জীবন। কতো বড়ো বাগান

দেখেছো? আরো একটি কারণে থেকে গিয়েছিলাম, রহমানের জন্য। যে স্ত্রী সংসার ছেলেমেয়ে ছেড়ে মাইক করে বেড়ায়, তার স্বামী কখনো সুখ-শান্তি পায় না। রহমানও পায়নি। তাদের ছেলেমেয়েরাও না। বুঝিনা, তার মতো মেয়েরা ছেলেমেয়ের মা হতে যায় কোন আক্কেলে। লীনা এতোদূর পড়াশুনো করেছে শুধুমাত্র আমার কারণে। মাসুদ, আর টিনাও আমাকে ছাড়া যেতে পারে না। বুঝলে, এই রহমান আর তার ছেলেমেয়েদের জন্যেই আমি থেকে গেছিলাম।'

এতোগুলো কথা বলে হাসিনা বেগম হাঁফিয়ে উঠলেন। তাঁর দিকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে তাকালাম। বোনের জন্য ভদ্রমহিলা সারাটা জীবন ত্যাগ করে গেছেন। জিজ্ঞেস করলাম, 'রহমান সাহেব কি করেন?'

'কিছু না। মাঝে মাঝে কি সব ছাই-ভস্ম লেখে। কেন যে লেখে, তা-ও বুঝি না! এখন পর্যন্ত এমন কাউকে তো দেখলাম না যে ওর একটা বইও পড়েছে! ইতিহাস নিয়ে কি সব লেখালেখি করে। জানো তো, আজকাল ওসব বই কেউ পড়ে না। ওদের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা এটাই যে, অভাব কাকে বলে ওরা জানে না।'

'তার চলে কিভাবে?'

'দুলাভাইয়ের টাকায়। রহমান বছরে বছরে বাপের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা পেতো। রউফকে তিনি তাঁর ইণ্ডাস্ট্রির

ডিরেক্টর করে নিয়েছিলেন। লীনা, মাসুদ আর টিনার সব খরচও তিনিই দিতেন। এছাড়া ওদের প্রত্যেকেরই চৌধুরী ইণ্ডাস্ট্রিজে শেয়ার আছে।'

একটু অবাক হয়ে বললাম, 'বলতে চান, তাঁর মৃত্যুর পর তারা কিছুই পাচ্ছে না।'

'পাগল নাকি। চৌধুরীর টাকার পরিমাণ সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণাই নেই দেখছি। ওরা প্রত্যেকে প্রচুর সম্পত্তি পাচ্ছে।'

প্রসঙ্গ পাল্টে সরাসরি প্রশ্ন করলাম, 'খুনী হিসেবে কাকে সন্দেহ করেন?'

বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে উত্তর দিলেন, 'জানি না। আর সেজন্যেই রাতে ভালো ঘুম হচ্ছে না। আমাদের মধ্যেই একজন খুনী, অথচ সে কে, কেউ জানে না। একথা ভাবলে মাথা ঠিক থাকে? তবে হ্যাঁ—পুলিস বোধহয় রত্নাকে সন্দেহ করছে।'

'আপনি করেন না?'

'তাকে আমি কখনো পছন্দ করতে পারিনি। তবু খুনী হিসেবে তাকে কল্পনা করতে পারছি না। অবশ্য ওর প্রতি সন্দেহ জাগাও স্বাভাবিক। একটি যুবতী মেয়ে যখন তার দাদার বয়েসী এক লোককে বিয়ে করে, তখন সবাই ভাবে মেয়েটি টাকার লোভে বিয়ে করেছে। রত্না হয়তো ভেবেছিলো, দুলাভাই অল্প কিছু দিনের মধ্যে মরে যাবে। কিন্তু দুলাভাই বুড়ো হলেও তার শরীর মজবুত ছিলো এবং

একশো বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারতো। কে জানে, রত্না হয়তো আর অপেক্ষা করতে চায়নি!'

'আপনি কি আর কাউকে সন্দেহ করেন?'

'না।'

তবু সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। মনে হলো, হাসিনা বেগম অনেক কিছু জানেন। তাছাড়া তিনি নিজেও তাঁর দুলাভাইকে খুন করতে পারেন। কিছুক্ষণ আগে তাঁকে যেভাবে ছোটো পোকাটি মারতে দেখলাম, তাতে তিনি যদি খুনী প্রমাণিত হন, মোটেও অবাক হবো না। লীনাও আমাকে তাই বোঝাতে চেয়েছিলো। তিন মিনারের প্রতিটি মানুষ খুন করতে পারে, যদি খুন করার জন্য জোরালো মোটিভ থাকে।

কিন্তু হাসিনা বেগমের কি মোটিভ থাকতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে চিরকুমারী এই বৃদ্ধার অতীত সম্পর্কে আমাকে আরো অনেক কিছু জানতে হবে।

ছয়

বাড়ির বড়ো দরজাটা খোলাই ছিলো। ভিতরে ঢুকে লম্বা একটা করিডর পার হলাম। সামনে একটি বড়ো সিঁড়ি পড়লো। হাসিনা বেগম বললেন, 'ওপর তলায় রত্না থাকে। নিচ তলার ঐ ডান দিকের অংশটায় রহমান থাকে তার পরিবার নিয়ে।'

ডান দিকে টার্ন নিয়ে উনি আমাকে একটি সুন্দর ছিমছাম ড্রয়িংরুমে নিয়ে গেলেন। বললেন, 'রহমানের সঙ্গে দেখা করবে?'

আসলে এই মুহূর্তে আমার কি করণীয়, তা আমার ঠিক জানা নেই। বাবার প্ল্যান অনুযায়ী আমি এসেছি এখানে। কিন্তু কিভাবে কী করতে হবে, আমি জানি না। লীনা এখন কোথায়? এই মুহূর্তে তাকে আমার খুবই প্রয়োজন। অন্তত সে আমাকে সঠিক পথ দেখাতে পারতো। ইন্সপেক্টর মাহবুবই বা কোথায় গেলেন? ভদ্রমহিলা উত্তরের আশা ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'চলো। রহমানের স্টাডি রুম এদিকে।'

বুঝতে পারছি না, আমার হবু শ্বশুরকে কি বলবো বা নিজের পরিচয় কিভাবে দেবো। তার মেয়ের এককালীন সহপাঠী? প্রেমিক? নাকি সি. আই. ডি.র লোক?

আরেকটি করিডর পার হয়ে চৌধুরী সাহেবের স্টাডি রুমে ঢুকলাম। রুমের চারদিকে বইয়ের ছড়াছড়ি। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত ঘরের প্রতিটি কোণ বইয়ে ঠাসা। কোনো তামাকের গন্ধ নাকে এলো না। চৌধুরী সাহেব বোধহয় পাইপ বা সিগার—কোনোটাতেই অভ্যস্ত নন।

আমাদের দেখে রহমান সাহেব তাঁর রিভল্‌ভিং চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়েস, সুদর্শন এবং দীর্ঘদেহের অধিকারী। সবার মুখে শুনেছি, মোবারক চৌধুরীর চেহারা কুৎসিত ছিলো। এখন দেখছি, তাঁর মেজো ছেলে একেবারেই তাঁর বিপরীত চেহারা পেয়েছেন। হাসিনা খালা আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমার সাথে হাত মিলিয়ে তিনি সৌজন্য মূলক কয়েকটি কথা উচ্চারণ করলেন। হতাশ হলাম। মনে হলো, আমার ব্যাপারে তিনি মোটেও আগ্রহী নন। মনটা খারাপ হয়ে গেল। হাজার হোক তিনি আমার হবু শ্বশুর।

হাসিনা বেগম জিজ্ঞেস করলেন, 'ইন্সপেক্টর কোথায়? তোমার সঙ্গে আজ দেখা করেনি?'

রহমান সাহেব উত্তর দিলেন, 'না। তবে যে-কোনো সময় এসে পড়বে।'

'এখন কোথায়?'

'জানি না। হয়তো দোতলায়।'

'রত্নার কাছে?'

'বোধ হয়।'

খুব ঠাণ্ডা মেজাজ রহমান চৌধুরীর। মনে হলো কোনো কিছুই তাকে উত্তেজিত করে না। এও মনে হলো, কোনো শক্ত মোটিভ ছাড়া তিনি কখনো নিজ পিতাকে খুন করবেন না।

হাসিনা বেগম প্রশ্ন করলেন, 'মাজেদা এখনো ঘুম থেকে ওঠেনি?'

'বোধহয় না। দশটার আগে তার ঘুম কখনো ভাঙে না।'

ঠিক এই সময় দরজাটা খুলে গেল এবং মাঝ বয়েসী এক সুন্দরী রমণী ঘরে ঢুকলেন। আন্দাজ করলাম, ইনি হচ্ছেন আমার হবু শ্বাশুরী। আকাশী রঙের জামদানী শাড়ি পরে আছেন। ব্লাউজ থেকে শুরু করে স্যাণ্ডেল পর্যন্ত সব কিছু শাড়ির সঙ্গে ম্যাচিং করে পরা। সম্ভবত এই মাত্র গোসল সেরে বাথরুম থেকে বেরুলেন। হাই হীলের খট্‌খট্ শব্দ তুলে স্বামীর পাশে এসে দাঁড়ালেন তিনি এবং উঁচুগলায় কথা বলতে আরম্ভ করলেন! আমার দিকে একবারও তাকালেন না, অথবা তাকানো প্রয়োজন মনে করলেন না। 'রহমান, এসব আমার আর সহ্য হচ্ছে না। সাংবাদিকরা আমাকে নিয়ে কতো যে কথা লিখবে, খোদাই জানেন। কোর্টেও নাকি যেতে হবে। ভালো কথা মনে পড়লো, কোর্টে পরার মতো আমার তেমন কোনো শাড়ি নেই। একটা কালো রঙের শাড়ি কিনলে কেমন

হয়? কিন্তু ঘর ছেড়ে যাওয়াও তো বারণ। রহমান, কি করা যায় বলো তো? তুমি তো সারাক্ষণ চাপা পড়ে থাকো তোমার ওই মোটা মোটা বইগুলোর স্তূপের নিচে! পৃথিবীটা ধসে পড়লেও তুমি এজায়গা ছেড়ে নড়বে না।'

শাড়ির আঁচলটা প্রায় খসে পড়ছিলো, ওটা ঠিক করে আবার বলে উঠলেন, হায় খোদা, বুড়ো লোকটা কেন যে এভাবে মরলো। আমাদের কারো সাথে কখনো কোনো খারাপ ব্যবহার করেনি। যদিও রত্নাটা সব সময় তাঁর কানে আমাদের বিরুদ্ধে বিষ ঢালতো। কিন্তু উনি কখনো কান দিতেন না। ডাইনীটা এখন মজা টের পাবে। এ বাড়ি ছেড়ে এক চুলও নড়বো না! দেখি, কি করতে পারে সে। খুনী, বদমাশ। ও হ্যাঁ, রত্নার চরিত্রটা বেশ ইন্টারেস্টিং কিন্তু। অভিনয় করলে কেমন হয়? আমাকে বেশ মানাবে, কি বলো রহমান।'

রহমান সাহেব কিছু বললেন না। চুপচাপ বসে রইলেন। এদিকে মাজেদা কি করে রত্নার চরিত্রটা অভিনয় করবেন, তার কিছু অংশ আমাদের দেখালেন। শেষ হলে আমার দিকে ফিরে মতামত জানতে চাইলেন আমার। বললাম, 'অপূর্ব হয়েছে।' লীনার মা'র মন আমাকে জয় করতে হবে। তিনি বলেই চলেছেন, 'ওই বেঁটে, মোটা মতো ইন্সপেক্টরটা কোথায়? রত্নার সব কথা আমি তাকে বলবো।'

রহমান সাহেব বললেন, 'তার সঙ্গে তোমার দেখা না করলেও চলবে মাজেদা। আমিই তার সঙ্গে কথা বলবো।'

মাজেদা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কি বলছো তুমি? এ বাড়ির কোনো খবরই তুমি রাখো না। কিন্তু আমি সবই জানি। খুঁটিনাটি সবই আমার নজরে পড়ে।'

হঠাৎ-ই ঘরে এসে ঢুকলো লীনা। মায়ের শেষ কথাগুলো তার কানে গেছে। সে বললো, 'মা, দোহাই তোমার। ইন্সপেক্টরের কাছে এমন কোনো কথা বলো না, যার কোনো ভিত্তি নেই।'

'কিন্তু লীনা...!'

'মা। তোমার মাথায় কি চিন্তা চলছে, আমার তা ভালো করে জানা আছে। কিন্তু সব সময় অভিনয় করা চলে না, মা।

'সবকথা তুমি জানো না। আমি যা বলছি, তুমি তাই করবে। ইন্সপেক্টরের সঙ্গে কথা বলার সময় সাবধানে কথা বলবে। যা যা জিজ্ঞেস করবে, শুধু তারই জবাব দেবে। তোমার জানা তথ্য তোমার কাছেই রাখো। এ বাড়ির মুখ রেখো, মা।'

মাজেদার চেহারায় সংশয় ফুটে উঠলো, 'যা জানি, তাও বলবো না?'

'আমরা কিছুই জানি না, মা।'

মা'র মুখে দুষ্টু হাসি দেখে লীনা আবার বলে উঠলো, 'ডাইনিং টেবিলে তোমার নাস্তা রাখা আছে, মা।'

'ঠিক আছে বাবা, যাচ্ছি। সত্যি খুব খিদে পেয়েছে।'

যাবার আগে আমার দিকে ফিরে বললেন, 'সব মেয়েরা তাদের মা'দের এক আধটু যত্ন করে; কিন্তু আমার মেয়েটা

একটু বেশি করে থাকে।'

তিনি চলে গেলে হাসিনা বেগম একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে লীনাকে বললেন, 'আল্লাই জানেন, তোর মা পুলিসের কাছে কতো বক বক করবে।'

লীনা দুষ্টু হাসি হেসে বললো, 'নিশ্চিন্তে থাকুন। বেশি কিছু বলবেন না।'

'তোর মাকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি।'

'না খালা। মা তার পরিচালকের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে থাকে। আর এই নাটকের পরিচালক আমি।'

এই বলে লীনা চলে গেল। একটু পরে আবার ফিরে এসে জানালো, 'মাহবুব সাহেব এসেছেন।' তার বাবাকে বললো, 'বাবা, ইন্সপেক্টরের সঙ্গে কথা বলার সময় জাহিদ থাকলে কোনো অসুবিধা হবে?'

মনে হলো, রহমান সাহেব কিছুটা অবাক হয়েছেন, তবে মুখে বললেন, অসুবিধার কিছু নেই।

এক মিনিট পর মাহবুব দৃঢ় পদক্ষেপে ঘরে এসে ঢুকলেন। লীনা এবং হাসিনা বেগম চলে গেলেন। মাহবুব চৌধুরীর মুখোমুখি বসলেন, বললেন, 'স্যার। জানি, আপনারা এখনো আপনার বাবার মৃত্যুর শোকটা কাটিয়ে উঠতে পারেননি। কিন্তু আমার কর্তব্য আমাকে করতে হবে। প্রথমে জানিয়ে রাখি যে আমাদের সন্দেহটা সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে। আপনার বাবার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি। আইজেরিন সল্যুশন ব্যবহারের ফলে তাঁর মৃত্যু ঘটে।'

চৌধুরী সাহেবের মুখে কোনো উত্তেজনার চিহ্ন লক্ষ্য করলাম না। মাথাটা সামান্য ঝাঁকালেন শুধু। মাহবুব বললেন, 'আপনার কি মনে হয়? ব্যাপারটা কিভাবে ঘটলো?'

'ঠিক জানি না। হতে পারে বাবাই ভুল করেছেন?'

'তাই মনে হয়?'

'ভুলে যাবেন না বাবার বয়েস হয়েছিলো; তার ওপর তাঁর দৃষ্টিশক্তিও ছিলো খুব দুর্বল।'

'আপনি বলতে চান ইনস্যুলিনের বদলে তিনি ভুল করে আইজেরিন ব্যবহার করেছিলেন।'

রহমান সাহেব কোনো উত্তর দিলেন না। মাহবুব বললেন, 'কিন্তু সে ক্ষেত্রে শিশিটার ওপর তাঁর হাতের ছাপ নেই কেন? ব্যাপারটা সত্যি আশ্চর্যজনক। শিশিটার ওপর কারো না কারো আঙুলের ছাপ থাকার কথা ছিলো। আপনার বাবার বা তাঁর স্ত্রীর।'

'আপনারা কি নজিবকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছেন?'

'আপনার বাবার সেই চাকরটা? আপনি কি তাকে সন্দেহ করেন? কিন্তু খুন করে তার কি লাভ? আপনার বাবা বছরের শেষে বেতন ছাড়া মোটা অঙ্কের টাকাও ওকে বোনাস হিসেবে দিতেন। আর বছরে বছরে টাকার পরিমাণ বাড়ানো হতো। আপনার বাবার মৃত্যুতে তার কোনো লাভ নেই; বরং ক্ষতি হবে। তাছাড়া আপনার বাবা তাকে খুব বিশ্বাসও করতেন।' চৌধুরী সাহেব এবারো কোনো উত্তর দিলেন না।

মাহবুব বললেন, 'হত্যার দিন আপনি কোথায় ছিলেন?'

'এই ঘরেই ছিলাম। লাঞ্চের সময় ছাড়া সেদিন ঘর ছেড়ে কোথাও যাইনি।'

'আপনার বাবার সঙ্গে দেখা হয়নি?'

'প্রতিদিন নাস্তার পর আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। সেদিনও তার ব্যতিক্রম হয়নি।'

'তিনি কি একা ছিলেন?'

'না। তাঁর স্ত্রী সঙ্গে ছিলেন।'

'তাঁকে স্বাভাবিক দেখাচ্ছিলো?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, ওপরে ওঠার জন্যে একটি মাত্র সিঁড়ি দেখলাম। ওটার মাথায় একটি দরজা আছে। দরজাটা কি তালা বন্ধ থাকে?'

'না।'

'কখনো না? এমন কি রাতেও না?'

'না!'

'মৃত্যুর খবরটা কিভাবে পেলেন?'

'আমার বড়ো ভাই রউফ আমাকে এসে জানালো, বাবার অবস্থা খুব খারাপ।'

'আপনি তখন কি করলেন?'

'ডাক্তারকে ফোন করলাম। কিন্তু পেলাম না। তাঁর জন্য একটি মেসেজ রেখে দোতলায় দৌড়ে গেলাম। ডাক্তার আসার অল্প কিছুক্ষণ আগে বাবা মারা যান।'

রহমান চৌধুরী খুব সহজ নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে কথা বলছিলেন। যেন তাঁর বাবার নয়, অপরিচিত কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর বর্ণনা দিচ্ছেন।

'বাড়ির অন্য লোকেরা কে কোথায় ছিলো?'

'সবার কথা জানি না। তবে আমার স্ত্রী ঢাকায় গিয়েছিলো। লীনাও বোধ হয় বাড়িতে ছিলো না। মাসুদ আর টিনা যে যার ঘরে ছিলো।'

'কিছু মনে করবেন না, একটি ব্যক্তিগত প্রশ্ন করছি। আপনার বাবার মৃত্যুর ফলে আপনার বা আপনার ভাইয়ের আর্থিক অবস্থার কি কোনো পরিবর্তন হবে?'

'কয়েক বছর আগেই বাবা, ভবিষ্যতে যাতে আর্থিক দিক থেকে আমাদের কোনো অসুবিধা না হয় তার ব্যবস্থা করেছিলেন। বড়ো ভাইকে তিনি তাঁর ইণ্ডাস্ট্রির ম্যানেজিং ডিরেক্টর করেন আর তাঁর নামে ইণ্ডাস্ট্রির প্রায় অর্ধেক শেয়ার লিখে দেন। ব্যবসার প্রতি আমার আগ্রহ নেই দেখে, তিনি আমার নামে চল্লিশ লাখ টাকা লিখে দিয়েছিলেন।'

'দুভাইয়ের মধ্য সম্পত্তি ভাগাভাগির পর তাঁর কাছে কি আরো অনেক টাকা থেকে গেল?'

'না। তবে পরে অন্য ব্যবসাতে নেমে তিনি সেই টাকার প্রায় দ্বিগুণ রোজগার করলেন।'

প্রথম বারের মতো রহমান সাহেবের মুখে মুচকি হাসি দেখা দিলো। বললেন, 'বাবা ঝানু ব্যবসায়ী ছিলেন। সহজে টাকা কামাই করার কৌশল তার ভালোই জানা ছিলো।'

'আপনারা কি আর্থিক অবস্থার কারণে এখানে থাকছেন?'

'না। এখানে থাকতে ভালো লাগে বলে। বাবাকে আমরা খুব ভালোবাসতাম। তিনিও আমাদের ছেড়ে থাকতে চাইতেন না।'

'আপনার বাবার উইল সম্পর্কে কোনো ধারণা আছে?'

'উইলের ব্যাপারে আমরা সবাই জানি। ক'বছর আগে বাবা সেটা নতুন করে লেখান। আমাদের সবার সামনে, তাঁর উকিল জামান সাহেবকে তিনি সেটা পড়ে শোনাতে বলেন। জামান সাহেব সম্ভবত আপনাকে ওটার কথা জানিয়েছেন। উইলে বাবা রত্নাকে ত্রিশ লক্ষ টাকা লিখে দিয়ে বাকি সম্পত্তি তিন ভাগে ভাগ করলেন। এক ভাগ আমার নামে, এক ভাগ রউফের নামে আর তৃতীয় ভাগ আমার তিন ছেলে-মেয়ের নামে।'

'কিছু মনে করবেন না চৌধুরী সাহেব। বর্তমানে আপনার কি কোনো আর্থিক অসুবিধা চলছে?'

মুচকি হাসি হেসে রহমান সাহেব উত্তর দিলেন, 'না। ইদানীং আমার আর্থিক অবস্থা একটু বেশি রকমের ভালো।'

তারপর খুবই শান্ত ভঙ্গিতে যোগ করলেন, 'ইন্সপেক্টর সাহেব, দরকার হলে আমি প্রমাণ করতে পারবো যে, বাবাকে খুন করার মতো আমার কোনো মোটিভ নেই; অন্তত টাকার জন্য তো নয়ই।'

'দুঃখিত। আমাদের চাকরিটা আসলে বিশ্রী ধরনের। তদন্তের খাতিরে অনেক সময় লোককে কতকগুলো বিরক্তকর

প্রশ্ন করতে হয়, যেমন আমার পরবর্তী প্রশ্নটা। আচ্ছা আপনার বাবার সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর সম্পর্ক কেমন ছিলো?'

'যতোদূর জানি, ভালো।'

'কোনো ঝগড়াঝাটি হতো?'

'মনে হয় না।'

'আপনার বাবার দ্বিতীয় বিয়ের ব্যাপারে আপনার মত ছিলো?'

'বাবা আমার কোনো মতামত জানতে চাননি।'

'উত্তরটা এড়িয়ে যাবেন না প্লীজ।'

'না। ছিলো না। আমার মনে হয়েছিলো, বাবা ভুল করছেন।'

'আপনার বাবাকে সেটা জানিয়েছিলেন?'

'না। কারণ বিয়ে হবার পর, আমি খবরটা জানতে পারি।'

'তার ওপর নিশ্চয় রাগ করেছিলেন?'

'না। বিয়ে করার অধিকার তাঁর ছিলো।'

'আপনার বাবার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেমন?'

'ভালো।'

মাহবুব অন্য প্রসঙ্গে ফিরে গেলেন, 'সাদিকুর রহমান সম্পর্কে কোনো তথ্য দিতে পারবেন?'

'মনে হয় না। বাবাই তাকে নিযুক্ত করেছিলেন।'

'কিন্তু সে তো আপনার ছেলেমেয়েকে পড়ায়।'

'তা ঠিক। মাসুদ ছোটবেলায় একবার পায়ে ব্যথ

পেয়েছিলো। এখনো একটু খুঁড়িয়ে হাঁটে। তাই তাকে স্কুলে না পাঠিয়ে বাসায় পড়ানোর জন্য ভালো একজন মাস্টারের খোঁজ করা হয়। কিন্তু দেশব্যাপী গণ-আন্দোলনের জোয়ারে তেমন কাউকে পাওয়া গেল না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর বাবা সাদিককে পেলেন। সত্যি বলতে কি, ছেলেটা শিক্ষক হিসেবে ভালো। তাই টিনাকে পড়ানোর ভারও তার ওপর পড়লো।'

'সে কি এ বাড়িতে থাকে?'

'না। কাছাকাছি এক মেসে থাকে।'

'আরেকটি বিব্রতকর প্রশ্ন করছি। কিছু মনে করবেন না। আপনি কি কখনো রত্না আর সাদিকের মধ্যে কোনো ধরনের অ্যাফ্যায়ার লক্ষ্য করেছেন?'

তৃতীয় বারের মতো মাহবুব ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। বুঝতে পারলাম, ভদ্রলোক খুব নাজুক অবস্থায় পড়েছেন। রহমান সাহেব উত্তর দিলেন, 'না।'

'ঐ সম্পর্কে কি কোনো মন্তব্য শুনেছেন?'

'এসব কথায় খুব একটা কান দিই না, ইন্সপেক্টর।'

'হুঁ। আচ্ছা, চলি চৌধুরী সাহেব।'

মাহবুব উঠে দাঁড়ালেন। রহমান সাহেবকে ধন্যবাদ জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমিও তার পেছনে পেছনে বের হলাম। দরজাটা বন্ধ করে মাহবুব হাঁফ ছেড়ে বললেন, 'হলফ্ করে বলতে পারি, ভদ্রলোকের ব্লাডপ্রেশার বলে কিছু নেই এবং ভবিষ্যতেও কখনো হবে না।'

সাত

মাহবুব বললেন, 'চলুন, মিসেস মাজেদার সঙ্গে একটু আলাপ করা যাক।'

'শুনলাম, ভদ্রমহিলা নাকি ঝানু অভিনেত্রী।'

'অনেকে আছে যারা অল্প পরিশ্রম করে খ্যাতি অর্জন করে থাকে। মাজেদা তাদের একজন। দুটো নাটকে অভিনয় করে প্রচুর খ্যাতি কুড়িয়েছেন। শখের বশে অভিনয় করেন। টাকার কোনো অভাব নেই ভদ্রমহিলার। ইদানীং নাকি প্রযোজনাও করছেন। তাঁকে মোটেও প্রফেশনাল বলা যায় না। মাঝে মাঝে এমন সব চরিত্র করেন, যা মোটেও তাঁকে মানায় না। বেশি কথা বলেন বলে অনেক নির্দেশকই তাঁর সঙ্গে কাজ করতে চান না।'

লীনা এসে আমাদেরকে ড্রয়িংরুমে তার মায়ের কাছে নিয়ে গেল। ভিতরে ঢুকে একটি সোফায় এক ভদ্রমহিলাকে বসে থাকতে দেখলাম। প্রথমে চিনতে পারিনি, ভালোভাবে লক্ষ্য

করতেই বুঝলাম, ইনি আমার হবু শাশুড়ী ছাড়া আর কেউ নন। স্টাডিরুমের মাজেদা চৌধুরীর সঙ্গে এর কোনো মিল খুঁজে পেলাম না। মুখে প্রসাধনীর চিহ্নমাত্র নেই। সাধারণ একটি সুতির শাড়ি পরে চুপচাপ বসে আছেন মাজেদা চৌধুরী। আমাদের দেখে কথা বলে উঠলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে বুঝলাম, লীনা যা আদেশ করেছে তিনি তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে যাচ্ছেন।

'বসুন প্লীজ। বিশ্বাস করুন, ইন্সপেক্টর, এই পরিস্থিতি আমার জন্য খুবই নাজুক। আমার ক্যারিয়ার ধ্বংস হতে চলেছে। এবার বলুন, আপনাদের জন্যে আমি কি করতে পারি।'

'আমার প্রথম প্রশ্ন মিসেস চৌধুরী, যখন আপনার শ্বশুর নিহত হন, তখন আপনি কোথায় ছিলেন?'

'আমি তখন ঢাকা থেকে জয়দেবপুরের পথে ছিলাম। সেদিন এক বান্ধবীর সাথে হোটেল ইন্টারকনে লাঞ্চ করার পর মার্কেটিং করেছিলাম। বাড়ি ফিরে দুঃসংবাদটা শুনতে পাই।'

শেষের দিকে তাঁর কণ্ঠস্বরটা একটু কেঁপে উঠলো যেন। মনে মনে তাঁর অভিনয়ের প্রশংসা না করে পারলাম না। মাহবুব বললেন, 'আপনার শ্বশুরকে আপনি খুব পছন্দ করতেন, তাই না?'

'খুব। খুবই ভালোবাসতাম তাকে।'

তাঁর কণ্ঠস্বরটা বোধহয় একটু বেশি উঁচু হয়ে গিয়েছিলো.

লীনাকে আস্তে করে কেশে উঠতে শুনলাম। সঙ্গে সঙ্গে মাজেদার কণ্ঠটা আবার খাদে নামলো, 'তাঁকে আমরা সবাই ভালোবাসতাম।'

'মিসেস রত্নার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেমন?'

'তার সাথে আমাদের সবারই খুব কম দেখা সাক্ষাৎ হয়।'

'কেন?'

'বোধহয় সে একাকী থাকতে পছন্দ করে, তাই। বেচারী রত্না, নিশ্চয় একেবারে ভেঙে পড়েছে।'

লীনা আবার কেশে উঠলো। ইন্সপেক্টর বললেন, আপনার তাই মনে হয়?'

'ঠিক জানি না।'

'উনি কি সুখী ছিলেন?'

'সম্ভবত।'

'স্বামীর সাথে ঝগড়াঝাটি হতো?'

'সত্যি জানি না, ইন্সপেক্টর।'

'সাদিকুর রহমানের সঙ্গে তার কি কোনো ধরনের সম্পর্ক আছে?'

মাজেদা তাঁর আসনে সোজা হয়ে বসলেন। ভ্রূ দুটো কিঞ্চিৎ কুঁচকে উঠলো। বললেন, 'ভদ্রমহিলা সম্পর্কে এই ধরনের অশোভন ইঙ্গিত করা আপনার মোটেও উচিত হয়নি ইন্সপেক্টর। রত্না সামাজিক মেয়ে, তার সাথে অনেকের বন্ধুত্ব থাকতে পারে।'

'দুঃখিত। আর সাদিক? সে কি ধরনের ছেলে?'

'শান্ত এবং অত্যন্ত ভদ্র।'

'টীচার হিসাবে কেমন?'

'ঠিক জানি না। তবে রহমান তাকে পছন্দ করে।'

নাছোড়বান্দা ইন্সপেক্টর গলাটা ঝেড়ে আবার প্রশ্ন করলেন, 'ম্যাডাম, ওদের ব্যাপারে আরেকটু বললে উপকৃত হতাম।'

'দুঃখিত। আমি আর কিছু জানি না।'

মনে মনে আবারো আমার হবু শাশুড়ীর তারিফ করলাম। তিনি তাঁর পার্ট উত্তম রূপে সম্পাদন করেছেন।

মাহবুব উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'মাফ করবেন ম্যাডাম। সার্ভেন্টরা হয়তো এব্যাপারে কিছু জানতে পারে।'

মাজেদা কিছু বললেন না। মাহবুব রুম ছেড়ে চলে গেলেন। লীনা চেঁচিয়ে উঠলো, 'সাবাস, মা। চমৎকার ছিলো তোমার অভিনয়।'

মাজেদা খুশি হয়ে উঠলেন, 'সত্যি বলছিস?'

'হ্যাঁ, মা। সত্যি।' আমার দিকে ফিরে বললো, 'ইন্সপেক্টরের সঙ্গে তোমার থাকা উচিত জাহিদ।'

'কিন্তু...।'

বলতে চাইছিলাম, এই নাটকে আমার ভূমিকাটা কি? কিন্তু ওর মা'র সামনে প্রশ্নটা করতে পারলাম না।

মাজেদা চৌধুরী অবশ্য আমার ব্যাপারে কোনোরকম কৌতূহল প্রকাশ করলেন না। সি. আই. ডি.র লোক,

সাংবাদিক কিংবা তাঁর মেয়ের প্রেমিক, যেই হই না কেন; তাঁর কাছে আমি একজন দর্শক ছাড়া আর কিছু নই। তাঁর অভিনয় দেখে মুগ্ধ হলাম কিনা; সেটাই হচ্ছে তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

লীনার কথামতো মাহবুবকে অনুসরণ করলাম। লম্বা করিডরটা ধরে তিনি রউফ চৌধুরীর অ্যাপার্টমেন্টের দিকে হেঁটে যাচ্ছিলেন। সিদ্ধান্ত নিলাম তাঁকে আমার সমস্যাটা বলবো। বললাম, 'আচ্ছা ইন্সপেক্টর, বলুন তো, আমি এখানে কি করছি?'

অবাক হয়ে তিনি আমার দিকে তাকালেন, 'মানে?'

'কেউ যদি আমাকে প্রশ্নটা করে বসে, কি উত্তর দেবো?'

কিছুক্ষণ চিন্তা করে তিনি বললেন, 'কেউ কি প্রশ্নটা তুলেছে?'

'না।'

'তাহলে আপাততঃ চুপচাপ থাকুন। নিজ থেকে কোনো ব্যাখ্যা দিতে যাবেন না। দেখতেই পাচ্ছেন, ওরা সবাই নিজেদের ঝামেলা নিয়েই অস্থির। যতোক্ষণ ভান করছেন এবাড়িতে আপনার থাকার অধিকার আছে, ততোক্ষণ পর্যন্ত কেউ কোনো প্রশ্ন করবে না।'

হাঁটতে হাঁটতে তিনি বলে গেলেন, 'দেখা যাক, রউফ চৌধুরী কি বলেন। যদিও জানি, তিনিও একই তথ্য দেবেন। আসলে বুড়ো যখন মরে যায়, তখন কে কোথায় ছিলো, তা জানার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই আমার।'

অবাক হলাম, 'তাহলে জিজ্ঞেস করছেন কেন?'

'কারণ, এভাবে হয়তো ওদের কেউ কিছু বেফাঁস কথা বলে ফেলবে।'

গলার স্বরটা খাদে নামিয়ে বললেন, 'আমার মন বলছে, মাজেদা চৌধুরী ইচ্ছে করলে আমাদেরকে আরো অনেক তথ্য দিতে পারতেন। আমিও ছাড়ছি না। সুযোগের অপেক্ষায় থাকবো। আমার বিশ্বাস, এ বাড়ির প্রতিটি প্রাণী খুন করতে পারে। তাই খুনী কে আপাততঃ সেটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না, বরং আমি খুনের মোটিভ জানতে চাই।'

একটা বন্ধ দরজার সামনে গিয়ে থামলাম। মাহবুব নক করার সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা খুলে গেল। সামনে দাঁড়ানো ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে মনে মনে তার জন্য করুণা বোধ করলাম। রহমান চৌধুরীর সঙ্গে এই ভদ্রলোকের চেহারার বা দৈহিক আকৃতির কোনো মিলই খুঁজে পেলাম না। রহমান চৌধুরীকে এক কথায় সুদর্শন ব্যক্তি বলা যায়। আর এই ভদ্রলোকের মুখশ্রী বলতে কিছু নেই। ছোটোখাটো একটা গরিলা যেন। বাপের চেহারাটা পেয়েছেন রউফ চৌধুরী, তবে এজন্য তাঁর মনে কোনো ক্ষোভ আছে বলে মনে হলো না। উৎফুল্ল মনে আমাদেরকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে ড্রয়িংরুমে নিয়ে গেলেন তিনি বললেন, 'আরাম করে বসুন, প্লীজ। আমি সাবিনাকে এখনই ডাকছি। সাবিনা। ওহ, এইতো এসে গেছে। ভালোই হয়েছে, ইনি হচ্ছেন ইন্সপেক্টর মাহবুব। আমার সিগার-কেসটা কোথায়? এক মিনিট

ইন্সপেক্টর, আমি চুরুটের বাক্সটা নিয়ে এখনই আসছি।'

ঘর ছেড়ে তিনি ঝড়ের গতিতে চলে গেলেন। হঠাৎ করে ঘরটা নিরব হয়ে গেল। মনে মনে ভাবলাম, রউফ সাহেবের সঙ্গে তেমন চাপাচাপি করতে হবে না, তিনি নিজ থেকেই আমাদের অনেক তথ্য জানাবেন। সাবিনা চৌধুরী আমাদের সামনে একটি চেয়ার টেনে বসে পড়লেন। বুঝতে দেরি হলো না, ভদ্রমহিলা অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং আত্মবিশ্বাসী। ভাবলাম, রউফ চৌধুরীর মতো একজন আবেগপ্রবণ মানুষের জন্য ঠিক এমনই একজন স্ত্রীর প্রয়োজন।

আমরা যে ঘরটায় বসে আছি, সেটিকে খুটিয়ে খুটিয়ে দেখতে লাগলাম। সাধারণ একটি ছিমছাম ড্রয়িংরুম। চাকচিক্যের কোনো বালাই নেই। আসবাব পত্রগুলো অনেক দিনের পুরানো। দেয়ালে কোনো পেইন্টিং দেখলাম না। একটি ফুলদানি পর্যন্ত নেই কোথাও।

মাজেদার অ্যাপার্টমেন্টের সঙ্গে সাবিনার অ্যাপার্টমেন্টের প্রভেদ যেমন লক্ষণীয়, তেমনি মানুষ দুটির মধ্যেও যথেষ্ট পার্থক্য চোখে পড়ে। প্রথম জন বহুমুখী চরিত্রের অধিকারি, পক্ষান্তরে দ্বিতীয় জনের একটি মাত্র ব্যক্তিত্ব যেটি অকৃত্রিম এবং অপরিবর্তনীয়।

সাবিনা চৌধুরীর বয়েস আন্দাজ করলাম। পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে। মাঝারি গড়ন। চোখ দুটো বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিচ্ছে। সাধারণ একটি তাঁতের শাড়ি তাঁর পরনে। কশলাদি বিনিময়ের পর তিনি মাহবুবকে জিজ্ঞেস করলেন,

তিনি কোনো নতুন তথ্য পেয়েছেন কিনা। মাহবুব উত্তর দিলেন, 'জ্বি। প্রমাণ পাওয়া গেছে, আইজেরিনের বিষক্রিয়ার ফলে মৃত্যুটা ঘটেছে।'

সম্পূর্ণ শান্ত ভঙ্গিতে সাবিনা চৌধুরী বললেন, 'অর্থাৎ এটা একটি মার্ডার। আশা করেছিলাম এটা হয়তো স্রেফ কোনো দুর্ঘটনাই হবে।'

'না, ম্যাডাম।'

'আমার স্বামী খবরটা শুনে খুব আঘাত পাবে। খুব সেন্টিমেন্টাল মানুষ। তাছাড়া বাবাকে ও ভীষণ ভালোবাসতো।'

'আপনার সাথে আপনার শ্বশুরের সম্পর্ক কেমন ছিলো?'

'ভালোই।' তারপর যোগ করলেন, 'তবে তাঁকে আমি খুব একটা পছন্দ করতাম না।'

'কেন?'

'তাঁর কাজকর্মকে আমি কখনো সমর্থন করিনি। তাঁর কাজ হাসিল করার উপায়ও আমি অপছন্দ করতাম।'

'আর রত্না?'

'তার সাথে বেশি দেখা সাক্ষাৎ হতো না।'

'সাদিকুর রহমানের সঙ্গে তার কি কোনো হৃদয় ঘটিত ব্যাপার স্যাপার আছে?'

'মনে হয় না। আর থাকলেও আমার তা জানার কথা নয়।'

তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে বুঝলাম, সত্যি সত্যি ও ব্যাপারে তাঁর

কোনো আগ্রহ নেই।

এই সময় রউফ চৌধুরী আবার ঘরে ফিরে এলেন। বললেন, 'দুঃখিত। একটু দেরি হয়ে গেল। এবার বলুন ইন্সপেক্টর, আমার বাবার মৃত্যু কেমন করে হলো, জানলেন কিছু?'

'জ্বি। আইজেরিন ব্যবহারের ফলে তাঁর মৃত্যু ঘটে।'

চিৎকার করে উঠে দাঁড়ালেন রউফ চৌধুরী, 'খোদা! শয়তান মেয়েলোকটা তাহলে আর অপেক্ষা করতে পারলো না। বাবার কারণে সে নতুন জীবন পেয়েছিলো; অথচ সেই ভালো মানুষটাকে সে নিজ হাতে খুন করলো। ওহ্, ইচ্ছে করছে...।'

মাহবুব তাঁকে বাঁধা দিয়ে বললেন, 'তাকে সন্দেহ করার পেছনে কোনো কারণ আছে?'

রউফ চৌধুরী ঘরময় হাঁটাহাঁটি শুরু করলেন। অস্থির ভঙ্গিতে চুলে হাত চালিয়ে বললেন, 'কারণ? সে খুনী না হলে তবে কে? তাকে আমি কখনো বিশ্বাস করতাম না। বেঈমান। বাবার ওই বয়সে আবার বিয়ে করাটাই স্রেফ পাগলামি ছিলো। ওহ্, বাবা, কেন তুমি ওই ডাইনীটাকে বিয়ে করতে গেলে।'

কথাগুলো বলে তিনি একটা চেয়ারে ধপ্ করে বসে পড়লেন। ছোটো বাচ্চার মতো দু'হাতে মুখ ঢেকে তিনি ফুঁপিয়ে উঠলেন। তাঁর স্ত্রী তাঁর কাঁধে একটি হাত রেখে বললেন, 'রউফ, শান্ত হও প্লীজ।'

'কি করে শান্ত হবো। কিভাবে…।'

'আমাদের সবাইকে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। ইন্সপেক্টর আমাদের সহযোগিতা চান…।'

আবার উঠে দাঁড়ালেন রউফ চৌধুরী। আরো জোরে চিৎকার করে উঠলেন, 'জানো সাবিনা, এই মুহূর্তে আমি কি করতে চাই? ওই ডাইনীর গলাটা টিপে ধরতে চাই। মেয়েলোকটা এখন আমার সামনে থাকলে তাকে আমি…।'

'রউফ!'

সাবিনার কণ্ঠটা বরফের মতো ঠাণ্ডা শোনালো।

মাথা নিচু করে রউফ চৌধুরী আমতা আমতা করে বললেন, 'দুঃখিত সাবিনা।' আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি সত্যি দুঃখিত। কিছু মনে করবেন না।' তারপর মাথা নিচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সাবিনা চৌধুরী আমাদের দিকে চেয়ে হাসলেন, 'রেগে গেলে ওর মাথাটা একদম ঠিক থাকে না। এসত্ত্বেও সে একটি ইঁদুর পর্যন্ত মারতে পারবে না।'

মাহবুব মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলেন। তারপর সাবিনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। সাবিনা চৌধুরী প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত ভাবে দিলেন। জানালেন, সেদিন সকাল বেলায় রউফ তাঁর অফিসে ছিলেন এবং দুপুরের দিকে বাড়ি ফিরে আসেন। সাবিনা জানালেন, তিনি আট বছর ধরে একটি মেয়েদের কলেজে পড়াচ্ছেন। নিত্যদিনের মতো সেদিনও তিনি সকাল বেলায় কলেজে চলে যান এবং বাড়ি

ফেরেন সন্ধ্যা প্রায় ছ'টায়।

'সেদিন আপনার শ্বশুরের সঙ্গে দেখা হয়েছিলো?'

'না। তার আগের দিন রাতে খাবার সময় তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়।'

মাহবুব আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'মৃত্যুর দিন দেখা হয়নি?'

'না। তবে রউফের পাইপ খুঁজতে একবার ওপর তলায় গিয়েছিলাম। করিডরের একটি টেবিলের ওপর পাইপটা পাই, সেটা নিয়ে তক্ষুণি ফিরে আসি। আমার শ্বশুরের রুমে যাইনি, কারণ ছ'টার দিকে তিনি ঘুমিয়ে থাকেন।'

মাহবুব আরো কয়েকটি প্রশ্ন করলেন এবং সবশেষে তিনি তাঁদের অ্যাপার্টমেন্টটা ঘুরে দেখার জন্য অনুমতি চাইলেন। সাবিনা বিস্মিত হলেও আপত্তি করলেন না।

প্রথমে তিনি তাঁদের শোবার ঘরটায় নিয়ে গেলেন আমাদের। ডাইনিং রুম, কিচেন এমন কি বাথরুম দুটোও দেখালেন। কোথাও তেমন সৌখিনতার চিহ্ন দেখলাম না। পুরো অ্যাপার্টমেন্টটাই অতি সাধারণ। সবশেষে তিনি রউফ চৌধুরীর অফিসরুমে নিয়ে গেলেন আমাদের। বললেন, 'বাড়িতে থাকলে তার বেশিরভাগ সময় এই ঘরটায় কাটে।'

অফিস ঘরটা অন্য ঘরগুলোর তুলনায় কিছুটা অগোছালো। চারদিকে কাগজ আর ফাইলের ছড়াছড়ি দেখতে পেলাম। দেয়ালে কয়েকটি ফ্রেম বাঁধানো ছবিও চোখে পড়লো। ভাবলাম, এ ঘরে যে-ই ঢুকুক না কেন, সে-ই

অনুভব করবে ঘরটায় একজন সুন্দর এবং বন্ধুসুলভ মনের মানুষ বসেন। রউফ সাহেব তার চেয়ার থেকে উঠে আমাদের দুটো চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললেন। স্ত্রীকে বললেন আমাদের জন্যে কফি নিয়ে আসতে। আমাদের দিকে তাকিয়ে লজ্জিত হাসি হেসে বললেন, 'আমি আবারো ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আসলে বাবার মৃত্যুর পর থেকে নিজেকে ঠিক কন্ট্রোলে রাখতে পারছি না।' চারদিকে চোখ বুলিয়ে যখন নিশ্চিত হলেন, সাবিনা ঘরে নেই; তখন যোগ করলেন, 'আমার স্ত্রী, বুঝলেন, চমৎকার মহিলা। এই দুঃসময়ে ভেঙে পড়েনি। সারাক্ষণ আমার পাশাপাশি থেকেছে। বিয়ের আগে ওর জীবনটা মোটেই সুখের ছিলো না। ওর প্রথম স্বামী ছিলেন চমৎকার মানুষ। তবে বড্ড কাজপাগলা। তাঁর হৃদরোগ ছিলো। ডাক্তারের নিষেধ সত্ত্বেও দিন রাত কাজ করতেন। কি একটা গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন যেন। ফলে অল্পবয়সে তাঁর হার্ট-অ্যাটাক হয়। ভদ্রলোক মারা গেলে সাবিনা খুব ভেঙে পড়ে। কিছুদিন পর আমার সঙ্গে তার বিয়ে হয়। তাকে আমি বার বার চাকরি করতে বারণ করেছি। কিন্তু ঘরে বসে থাকার মতো মেয়ে ও নয়। এবার বলুন ইন্সপেক্টর, আমাকে কি জিজ্ঞেস করতে চান?'

মাহবুব কেশে গলাটা পরিষ্কার করলেন, তারপর বললেন, 'আপনার বাবার অসুস্থতার খবর আপনি কিভাবে জানতে পারেন?'

'রত্না এসে আমাকে জানাল। সঙ্গে সঙ্গে আমি ওপর তলায় দৌড়ে গেলাম। মনে মনে অবাকই হয়েছিলাম।

কারণ, মাত্র আধঘন্টা আগেই তাঁর সঙ্গে আমি কথা বলেছিলাম এবং তিনি তখন দিব্যি সুস্থ। খবর পেয়ে তাঁর ঘরে গিয়ে দেখি বাবা বিছানায় পড়ে আছেন। মুখটা সম্পূর্ণ ফ্যাকাসে। আর কি যেন সব আবোল-তাবোল বকছিলেন। দৌড়ে গিয়ে রহমানকে ব্যাপারটা জানালাম। সে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারকে ফোন করলো, ঐ সময় আমাদের আর কিছুই করার ছিলো না।'

কফি খেয়ে আধঘন্টা পরে চৌধুরী দম্পতির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাঁদের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বের হলাম। হাঁটতে হাঁটতে মাহবুব বললেন, 'দুই ভাইয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য।' কিছুক্ষণ চুপ থেকে যোগ করলেন, 'রউফ চৌধুরীকে দেখে সত্যি মনে হয়, তিনি একটি মাছিরও ক্ষতি করতে পারবেন না; কিন্তু তাঁর স্ত্রীর বেলায় কথাটা মোটেও খাটে না।'

বললাম, 'কিন্তু উনি খুন করতে যাবেন কেন? যদিও স্বীকার করেছিলেন, শ্বশুরকে তিনি পছন্দ করতেন না; কিন্তু শুধুমাত্র ঘৃণার কারণে এই পৃথিবীতে ক'টিই বা খুন হয়েছে?'

মাহবুব উত্তর দিলেন, 'খুবই কম। ব্যক্তিগতভাবে আমি একটিও দেখিনি। আর তাই রত্না ছাড়া আর কাউকে সন্দেহ করতে পারছি না।'

আট

ওপর তলায় উঠে গেলাম। দরজায় নক করলে মোটাসোটা এক ঝি দরজা খুলে আমাদের দিকে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। মাহবুব বললেন, 'মিসেস রত্না আছেন?'

কোনো কথা না বলে মাথা ঝাঁকিয়ে সে আমাদেরকে একটি ড্রয়িং রুমে নিয়ে বসিয়ে দিলো। ঘরের এক কোণায় মোবারক চৌধুরীর একটি তৈলচিত্র নজরে পড়লো। ছবির মানুষটার চোখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ উপলব্ধি করলাম, হাসিনা বেগম ঠিকই বলেছেন, বুড়োকে ছাড়া বাড়িটা একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে।

এমন সময় মাহবুবের ডান হাত সার্জেন্ট খলিল, ঘরের ভেতর ঢুকে বললো, 'চাকর-বাকরদের জবানবন্দী নেয়া হয়ে গেছে। ওদের কাছ থেকে তেমন কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।'

আমাদের পাশেই সার্জেন্ট একটি চেয়ার টেনে বসে পড়লো এবং রত্নার জবানবন্দী লেখার জন্য কাগজ কলম বের

করে প্রস্তুত হলো। কিছুক্ষণ পরে এই নাটকের প্রধান চরিত্র মোবারক চৌধুরীর দ্বিতীয় স্ত্রীর আগমন ঘটলো। ছোটোখাটো গড়ন, অপূর্ব মুখমণ্ডল, সেখানে কসমেটিক্সের চিহ্ন সামান্য। কালো ঘন দীর্ঘ চুলগুলো অত্যন্ত অবহেলার সঙ্গে উঁচু করে বেঁধে রেখেছে। টানা টানা চোখ দুটো লাল হয়ে আছে। সম্ভবত কিছুক্ষণ আগে রত্না কাঁদছিলো। তা সত্ত্বেও তাকে দেখে আমি মুগ্ধ হলাম। আরেকটি ব্যাপার লক্ষ্য করলাম, রত্নার হাত দুটো মৃদু কাঁপছে।

মাহবুব তাকে আবার বিরক্ত করার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন। রত্না মৃদু স্বরে বললো, 'ও কিছু না। আপনি আপনার কর্তব্য করুন ইন্সপেক্টর।'

'ম্যাডাম। আমি এখনো বলছি, আপনি আপনার উকিলকে খবর পাঠালে ভালো করবেন।'

'আপাততঃ তার কোনো দরকার নেই।' একটু থেমে প্রশ্ন করলো, 'কিছু জানতে পেলেন?'

'খুব সামান্য। শুধু এতোটুকু জানা গেছে যে ইনস্যুলিন নয়, তাঁকে আইজেরিন ইনজেকশন দেয়া হয়েছিলো।'

'আইজেরিন? তাঁর আই ড্রপ?' বিস্মিত হয়ে রত্না বললো।

'সম্ভবত ভুল করে আপনি ইনস্যুলিনের বদলে সিরিঞ্জে আইজেরিন ভরে দিয়েছিলেন।'

'অসম্ভব। এমন ভুল আমি করতে পারি না।'

'হয়তো আপনার অজান্তে কেউ একজন ইনস্যুলিনের

শিশিতে আইজেরিন ভরে রেখেছিলো।'

'কিন্তু কেন? কে এমন নিষ্ঠুর কাজ করলো?' রত্নার চোখ দুটো পানিতে ভরে উঠলো।

'ভালো করে ভেবে দেখুন। আপনার স্বামীর সঙ্গে কারো কোনো বিরোধ ছিলো?'

'ঠিক জানি না।'

'আপনার প্রথম জবানবন্দীতে বলেছিলেন, মৃত্যুর দিন লাঞ্চের পর সিনেমা দেখতে বাইরে গিয়েছিলেন। তাই না?'

'হ্যাঁ। এবং সাড়ে ছ'টার দিকে ফিরে এসেছিলাম। তাঁকে ইনজেকশন পুশ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখটা সাদা হয়ে গেল এবং তিনি বাতাসের জন্য হাঁসফাঁস করতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিচে নেমে রউফকে খবর দিলাম। আগে তো এসব বহুবার বলেছি, আর কতোবার বলতে হবে?'

শেষের বাক্যটি বলে একটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো রত্না। মাহবুব বললেন, 'দুঃখিত ম্যাডাম। আমরা তাহলে এখন উঠি। সাদিকুর রহমানের সঙ্গে দেখা করতে হবে।' কথাটা বলে মাহবুব রত্নার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

'সাদিক? কেন? সে তো এসবের কিছুই জানে না।'

'তবু তার সঙ্গে কথা বলতে হবে। তাকে কোথায় পাবো, বলতে পারেন?'

সুন্দর চোখ জোড়া তুলে আমাদের দিকে এক সেকেণ্ড তাকালো রত্না। মুখটা পাণ্ডুর দেখালো। বললো, 'সম্ভবত নিচতলায় মাসুদকে পড়াচ্ছে।'

রত্নার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি আর মাহবুব সার্জেন্ট খলিলকে অনুসরণ করলাম। সাদিককে পেলাম একতলার একটি ক্ষুদ্র ও সুসজ্জিত কক্ষে। ষোলো–সতেরো বছরের একটি ছেলে তার কাছে বসে পড়ছে। আমরা ঘরে ঢুকলে দুজনে এক সঙ্গে মাথা তুলে আমাদের দিকে তাকালো। মাসুদের সঙ্গে আমার চোখাচোখি হলো। আর সাদিকের দৃষ্টি সরাসরি ইন্সপেক্টরের মুখের ওপর আটকে গেল। সম্ভবত এর আগে আমি এমন ভীত দৃষ্টি আর কখনো কারো চোখে প্রত্যক্ষ করিনি। মনে হচ্ছিলো, লোকটা যেন এখনই মূর্ছা যাবে। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে সাদিক উঠে দাঁড়ালো। বললো, 'আসুন!'

'আপনার সঙ্গে দুটো কথা বলতে চাই।'

'অ্যাঁ…। হ্যাঁ, হ্যাঁ। বলুন।' সাদিকের মুখে ঘামের কয়েকটি ফোঁটা দেখা দিলো।

মাসুদ উঠে তার স্যারের কাছ থেকে চলে যাবার অনুমতি চাইলো। সাদিক বললো, 'ঠিক আছে, যাও। তবে আধঘন্টা পর ফিরে এসো।' ছেলেটা চলে গেল। লক্ষ্য করলাম, হাঁটার সময় সে সামান্য খুঁড়িয়ে হাঁটে। ইন্সপেক্টর সরাসরি সাদিককে আক্রমণ করলেন, 'পরীক্ষা করে জানা গেছে, মোবারক চৌধুরীর শরীরের আইজেরিন দ্রবণ ইনজেক্ট করেই তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।'

কোনো উত্তর এলো না। সাদিক চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলো। মাহবুব বললেন, 'কে বা কারা ইনস্যুলিনের

শিশিতে আইজেরিন ভরে রেখেছিলো।'

সাদিক ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে উঠলো, 'কী জঘন্য। কী অমানুষিক!'

'আমার প্রশ্ন হচ্ছে, তাঁকে খুন করে কার বেশি লাভ হবে?'

'জানি না।' সাদিকের চোখ দুটো কোটর ছেড়ে বের হতে চাইছে যেন।

'ও হ্যাঁ। ভালো কথা। ইচ্ছে করলে আপনি আপনার উকিলকে খবর দিতে পারেন।'

'আমার কোনো উকিল নেই। তার কোনো প্রয়োজনও নেই। আমি কোনো কিছু গোপন করছি না।'

'আপনার জবানবন্দী কিন্তু লিখিত ভাবে গ্রহণ করা হবে।'

মনে মনে মাহবুবের ওপর চটে গেলাম। লোকটিকে এভাবে ভয় দেখানোর কোনো মানে হয় না।

'আমি নির্দোষ। খোদার কসম। কাউকে খুন করিনি।'

'আমি কি বলেছি, আপনি খুন করেছেন?'

মাহবুব একটি সিগারেট ধরিয়ে মুখে দিলেন। সাদিককে অফার করলেন, কিন্তু সে ওটা প্রত্যাখ্যান করলো। আমি একটা নিলাম। ধোঁয়া ছেড়ে মাহবুব ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলেন, 'মিসেস রত্না বয়সে তাঁর স্বামীর চেয়ে অনেক ছোটো ছিলেন। তাই না?'

'বোধহয়...। মানে...হ্যাঁ।'

'নিশ্চয় ভদ্রমহিলা মাঝেমাঝে খুব একাকী বোধ করতেন, কি বলেন?' তার শিকারের দিকে তাকিয়ে মাহবুব স্মিত হাসলেন। মাথা নিচু করে সাদিক বসে থাকলো। কোনো উত্তর দিলো না।

'বাড়িতে আপনার মতো এক যুবককে দেখে নিশ্চয় তিনি উৎফুল্ল হয়েছিলেন। যতোদূর শুনেছি, আপনাদের মধ্যে ভালো বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিলো। তাই না?'

সাদিক জোরে মাথাটা নেড়ে বললো, 'বুঝতে পারছি আপনি কি মীন্ করছেন। কিন্তু আপনি ভুল করছেন। মিসেস রত্না আমাকে স্নেহ করেন, আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি। আমাদের মধ্যে অন্য কোনো সম্পর্ক নেই। আপনি যদি মনে করেন শুধুমাত্র এই কারণে আমি এক বৃদ্ধকে খুন করবো, তাহলে বলবো আপনাদের মাথা নিশ্চয় খারাপ হয়েছে।'

মাহবুব মাথা নেড়ে তার দুঃখ প্রকাশ করলেন, 'আমি আপনাকে সন্দেহ করছি না; কিন্তু...'

'আমি জানি, আপনি কি ভাবছেন। শুধু আপনি নন, অন্যেরা কি বলাবলি করছে, তাও জানি। নিজের জন্যে ভাবছি না। কিন্তু একজন ভদ্রমহিলা সম্পর্কে এধরনের কুচিন্তা করা মোটেও উচিত নয়। দুঃখিত, আমি আর কিছু বলবো না।'

হন্ হন্ করে সাদিকুর রহমান ঘর ছেড়ে চলে গেল। মাহবুব আমার দিকে ফিরে মুচকি হাসলেন, 'কেমন বুঝলেন?'

'ভদ্রলোক খুব ঘাবড়ে গেছেন।'

'ঠিক তাই। কিন্তু তার মতো লোক কি খুন করতে পারে?'

খলিল বললো, 'আমার মত যদি জানতে চান, বলবো এই লোক একটা মুরগিও জবাই করতে পারে না।'

'তাই মনে হয়? হয়তো কোনো ভায়োলেন্সের মাধ্যমে যাবে না। কিন্তু এই কেসটা ভিন্ন। এখানে কোনো ছোরা বা পিস্তল ব্যবহার করা হয়নি। বিষ প্রয়োগ খুব সহজ কাজ।'

খলিল তার ঢাউস গোঁফে তা' দিয়ে বললো, 'এমন হতে পারে না, মানবিক কারণে সে কাজটি করেছিলো?'

মাহবুব ব্যঙ্গ করে হাসলেন, 'মানবিক কারণ? তা বটে। কেননা কিছুদিন পরেই এক লক্ষপতি বিধবাকে বিয়ে করে বাকি জীবনটা প্রাচুর্যের মধ্যে কাটানোর মধ্যে অমানবিকতার অস্তিত্ব কোথায়? যাই হোক, এসবে কাজ হবে না। প্রমাণের দরকার। সাদিকের ভয় পাওয়াটা কোনো প্রমাণ নয়। আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, সাধারণত নির্দোষরাই ভীত হয়ে পড়ে। অথচ সেক্ষেত্রে খুনী সম্পূর্ণ নির্বিকার থাকে।'

খলিলের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'রত্না আর সাদিক সম্পর্কে বাড়ির সার্ভেন্টরা কি বললো?'

'হাসিনা বেগমের এক চাকরানী ওদের অ্যাফ্যায়ারের ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত।'

'নিশ্চিত হবার কারণ?'

'পরস্পরের প্রতি তাদের দৃষ্টিই নাকি সেই কথা বলে।'

'এটাও কোনো প্রমাণ নয়। আর কিছু?'

'না। আমার মনে হয় এ স্রেফ গুজব।' মাহবুব আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'জাহিদ সাহেব, আপনি কিন্তু আমাদের অনেক সাহায্য করতে পারেন। একে তো আপনি পুলিসের লোক নন, তার ওপর এ বাড়ির একজনের বিশেষ বন্ধু। আমার মনে হয় রত্না আপনার কাছে অনেক কিছু ফাঁস করতে পারে। যান না, দেখুন তার মুখ থেকে কিছু বের করতে পারেন কিনা।'

মোটেও অবাক লাগলো না আমার। এ প্রস্তাবটা আমি অনেকক্ষণ থেকে আশা করছিলাম। জানতাম, মাহবুব আমাকে ঠিকই তাঁর কাজে লাগাবেন। রত্নার ঘরের দিকে যেতে যেতে কেন যেন হঠাৎ করে মনটা খারাপ হয়ে গেল।

নয়

ড্রয়িংরুমে ঢুকে রত্নাকে সেই একই চেয়ারে একই ভঙ্গিতে বসে থাকতে দেখলাম। আমাকে দেখে বলে উঠলো, 'ইন্সপেক্টর কোথায়?'

'নিচ তলায় আছেন।'

'আপনি কে?'

সকাল থেকেই মনে মনে প্রশ্নটার জন্য প্রস্তুত ছিলাম, আর তাই উত্তরটাও তৈরি ছিলো, 'আমি পুলিসকে সাহায্য করছি। আবার এই পরিবারের বন্ধু হিসেবেও আমাকে ধরতে পারেন।'

'এই পরিবার?' রত্না নাক সিঁটকালো। 'এরা অমানুষ। এদের আমি ঘেন্না করি। শুনি, তারাও আমাকে সহ্য করতে পারে না। আমার দোষ, তাদের বাবাকে বিয়ে করেছিলাম। কেন করবো না? তাকে আমি ভালোবাসতাম। হয়তো বিশ্বাস করছেন না। কিন্তু তাঁর বয়েসটা আমার কাছে কোনো বাধা ছিলো না। ওরা তাঁকে কি দিয়েছে? এ সংসারের জন্যে

ওদের কেউ কখনো গায়ের এক ফোঁটা ঘাম পর্যন্ত ঝরায়নি। অথচ তাঁর টাকা-পয়সা, বাড়ি, গাড়ি দখল করে ভোগ করছে। তবু ওদের আরো চাই। তাঁর প্রতি তাদের কোনো মায়া-মমতা ছিলো না। কিন্তু আমার ছিলো।'

আমার দিকে চোখ তুলে রত্না তাকালো; যেন বুঝতে চাইলো, তার কথা বিশ্বাস করছি কি না। চ্যালেঞ্জের সুরে বললো, 'হ্যাঁ। তাঁকে ভালোবাসতাম। তিনি আমাকে তাঁর পাশে রানীর আসনে বসিয়েছিলেন। সুন্দর পৃথিবীটাকে আমার সামনে তুলে ধরেছিলেন।' রত্নার চোখ দুটো পানিতে ভরে উঠলো।

'তাঁকে ছাড়া আমি এখন অসহায়। খোদা, কি পাপ করেছিলাম? তিনিও আমাকে ভালোবাসতেন। আমার মাঝে সুখ খুঁজে পেয়েছিলেন; যা তাঁর ছেলেমেয়েরা কখনো তাঁকে দিতে পারেনি। তাঁর সাথে আমার কিভাবে পরিচয় হয়েছিলো, জানেন?'

বুঝলাম রত্না কথা বলে হাল্কা হতে চাইছে। তাকে নিরাশ করলাম না। মনোযোগী শ্রোতার আসনে বসে থাকলাম। সে বলে গেল,'তাঁর এক হোটেলে কাজ করতাম। জানতাম না, ওটার মালিক তিনিই ছিলেন। একদিন উনি এসে কফি চাইলেন। ওই দিন আমি আমার জীবনে একটি বড়ো রকমের আঘাত পেয়েছিলাম। খুব কাঁদছিলাম। তিনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বোধহয় তা বুঝতে পেরেছিলেন। আমাকে তার টেবিলে বসতে বললেন। বললাম, অসম্ভব

আমার চাকরি চলে যাবে। স্মিত হেসে তিনি বলেছিলেন, "বরং সেটাই হবে অসম্ভব, কারণ হোটেলটা আমার।" ছোটোখাটো মানুষটার দিকে তাকিয়ে অভয় পেলাম। পরে জানলাম, তাঁর ক্ষমতা অসীম। তাঁকে আমার সব কথা জানালাম। নিশ্চয় আপনিও আপনার বন্ধুদের কাছে আমার কাহিনীটা শুনেছেন। নিশ্চয় আপনাকে বলা হয়েছে, আমি একটা বাজে মেয়ে, যার সমাজে কোনো সম্মান ছিলো না।' জোরের সঙ্গে মাথা নেড়ে রত্না বলে গেল, 'কিন্তু আমি মোটেও তা ছিলাম না। আমি ভালো ঘরের মেয়ে। বাবা-মা আমাকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। কখনো কুসঙ্গে পড়িনি। একজনকে ভালোবেসেছিলাম, ওটাই আমার জীবনের একটি মাত্র ভুল ছিলো। দুজনে বিয়ে করবো বলে ঠিক করেছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিয়েটা আর হয়নি। উপরন্তু দুর্নামের শিকার হলাম। গঞ্জনায় বাড়িতে থাকতে পারলাম না। একদিন পালিয়ে গেলাম।'

রত্না থেমে গেল। চোখ দুটো রুমাল দিয়ে মুছলো। পুরনো স্মৃতি তাকে বেদনাহত করেছে। আমি চুপ করে বসে থাকলাম। কিছুক্ষণ পর আবার শুরু করলো রত্না, 'কোনো মন্তব্য না করে মোবারক আমার কথা শুনলেন। মুখ খুলে যখন কথা বললেন, মনে হলো, স্বপ্ন দেখছি। বললেন, আমাকে তিনি বিয়ে করতে চান। তিনিও একাকী বোধ করেন। এতো টাকা, এতো ক্ষমতা তাঁর কাছে এখন তুচ্ছ মনে হয়। তাঁর একজন জীবন সঙ্গী চাই। কাউকে না

জানিয়ে আমরা বিয়ে করলাম এবং হানিমুন করতে ইউরোপে চলে গেলাম।'

একটু থেমে যোগ করলো, 'আমরা সুখী ছিলাম। আরো সুখী হতে পারতাম যদি ঐ লোভী শকুনের দলটা আমাদের সঙ্গে না থাকতো। আমাকে খুনী প্রমাণ করার জন্য ওরা উঠে পড়ে লেগেছে। কিন্তু আমি তাঁকে খুন করিনি। বিশ্বাস করুন। এটা একটা ষড়যন্ত্র।' রত্না কান্নায় ভেঙে পড়লো। আমার মনটা বরাবরই নরম। তাকে ওই অবস্থায় দেখে মনটা আরো খারাপ হয়ে গেল। লীনাদের ওপর বিষিয়ে উঠলো মনটা। রত্না চোখ মুছে সোজা হয়ে বসলো, 'নিজের জন্য ভাবছি না। কিন্তু সাদিককেও তারা ছাড়বে না।'

'তাকে আপনি ভালো করে চেনেন?'

'খুব একটা না। তার জন্যে আমার দুঃখ হয়। একে তো অসুস্থ, তার ওপর এমন দুজনকে পড়াচ্ছে যারা এক কথায় অসহ্য। মাসুদ, এক অভদ্র বখাটে ছেলে, আর টিনা...ওহ্ গড, ওকে দেখেছেন?'

'না।'

'ওকে দেখলে আমার গা'টা ছম ছম করে ওঠে। ওকে আমার কখনো স্বাভাবিক মনে হয় না।।'

কিন্তু আমি টিনার কথা শুনতে আসিনি। সাদিকের প্রসঙ্গে ফিরে গেলাম। 'সাদিকের বাড়ি কোথায়?'

'জানি না। শুধু বলতে পারি সেও আমার মতো অসহায়। ওদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার ক্ষমতা আমাদের নেই। বিশেষ করে

ইন্সপেক্টরও যখন ওদের দলে আছে।'

'এতোটা ভেঙে পড়ছেন কেন?'

'ওদের একজনও তো খুনী হতে পারে। পারে না? বাইরের কেউ, চাকর-বাকররাও তো হতে পারে।'

'কিন্তু খুনের মোটিভ তো থাকতে হবে।'

'মোটিভ? বলতে চান, আমার আর সাদিকের মোটিভ ছিলো?'

লজ্জা পেলাম। তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'না...তা না। কিন্তু শুনলাম, আপনাদের মধ্যে, মানে...ইয়ে। বলতে চাই...' কিন্তু আমি কিছুই বলতে পারলাম না। রত্নাকে হতভম্ব দেখালো। তীব্র স্বরে বলে উঠলো, 'কতো নিচে নামতে পারে ওরা! অসভ্য, অভদ্র এরা সবাই। ছিঃ ছিঃ কি করে এমন কথা বলতে পারলো। সাদিকের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছাড়া আর কিছুই নেই। বিশ্বাস করুন।'

তাকে আমি বিশ্বাস করলাম। তবু কেন জানি মনে হলো, রত্না হয়তো নিজের অজান্তে সাদিককে ভালোবাসে।

একতলায় নেমে লীনাকে খুঁজছিলাম। হল রুমের দরজা দিয়ে তাকে উঁকি মারতে দেখলাম। আমাকে দেখে হাসলো, 'এসো। রান্না ঘরে যাবো বলে ভাবছিলাম।' আমার হাত ধরে একটি চেয়ারে বসিয়ে দিলো। পাশে বসে আমাকে খুটিয়ে খুটিয়ে লক্ষ্য করতে লাগলো। জিজ্ঞেস করলো, 'রত্নাকে দেখলে? কেমন লাগলো?'

'ভালো। সত্যি বলতে কি, তার জন্য দুঃখ হয় আমার।' ব্যঙ্গ করে হাসলো লীনা, 'অর্থাৎ তার দলে যোগ দিলে...।'

'আহা হা। চটছো কেন। আমি বলছি, তার অবস্থাটাও বুঝতে পারছি।'

'মানে...?'

'সত্যি করে বলো তো, এ বাড়িতে আসার পর থেকে রত্নার সঙ্গে তোমরা কেউ কখনো ভালো ব্যবহার করেছো? এ পরিবারের কেউ তাকে আপন বলে ভেবেছো?'

'না। ভাববোই বা কেন? জাহিদ, তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, রত্নাকে দেখে তুমি ভালোই মজেছো।'

'লীনা, বোকার মতো কথা বলো না।'

'আমি মোটেও বোকা নই। আমাকে অন্তত ঠকাতে পারোনি। রত্নার মতো মেয়েরা, যারা মিথ্যা কথা বলে দাদুর মতো বুড়ো লোকদের ঠকায় তাদের আমি ঘেন্না করি।'

'তুমি বলতে চাও, তোমার দাদুকে সে মিথ্যা বলেছিলো?'

'হ্যাঁ। পুরো কাহিনীটাই তার বানানো ছিলো।'

'কিন্তু তোমার দাদু ওকে ভালোবাসতেন। আমার মনে হয় তাঁর ওপর রত্নার কিছুটা প্রভাবও ছিলো।'

লীনা জোরে হেসে উঠলো, 'প্রভাব? দাদুর ওপর? তার ওপর কখনো কারো কোনো প্রভাব পড়তো না। তিনি রত্নাকে চেয়েছিলেন, এবং তাকে পেয়েছিলেন। ব্যবসার খাতিরে রত্নার মতো এক সুন্দরী সামাজিক মেয়ের তাঁর প্রয়োজন

ছিলো।'

'আর সাদিকুর রহমান? তাকেও বুঝি তিনি ব্যবসার খাতিরে চয়েস করেছিলেন?'

আমার কণ্ঠে বিদ্রূপ লক্ষ্য করে লীনা চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো, 'দাদুকে বোঝা মুশকিল ছিলো। হয়তো তিনি ভেবেছিলেন, সাদিকের মতো এক লাজুক ভীতু ধরনের ছেলে ঘরে থাকলে কোনো ক্ষতি হবে না। আবার রত্নার সময়টাও ভালো কাটবে। তাছাড়া এভাবে হয়তো রত্নার বাইরে যাবার নেশাটাও কিছুটা কমে যাবে।'

লীনা একটু থেমে যোগ করলো, 'দাদুকে ভালো করে চিনতাম বলে, একটা ব্যাপারে খটকা লাগছে। তাঁর মাথায় অসম্ভব বুদ্ধি ছিলো। রত্না আর সাদিক যদি তাঁকে খুন করার প্ল্যান করে থাকতো, তবে নিশ্চয় তিনি সেটা জানতে পারতেন। ভাবছি, উনি কেন সাবধান হলেন না। তবে কি রত্না খুনী নয়?'

হঠাৎ ঘড়ির দিকে চেয়ে বললো, 'কিছু ভাবতে পারছি না আর। যাই, দেখি খোদেজা কতো দূর কি করেছে।'

তার দিকে তাকিয়ে আমি হাসলাম, 'তোমার সাথে যেতে পারি?'

লীনাকে এক মুহূর্তের জন্যে ছাড়তেও আমার মন চাইছে না। কিন্তু সে আমাকে নিরাশ করলো, 'না। তুমি এখানেই থাকো।'

লীনা চলে গেল। আমি বসে বসে, আকাশ-পাতাল

ভাবতে লাগলাম। রত্নার দৃষ্টিভঙ্গিটা জানলাম। লীনা এবং তার পরিবারও রত্নার প্রতি তাদের মনোভাব ব্যক্ত করেছে। বুঝলাম, তারা কোনো আগন্তুককে সহজে এই পরিবারে ঠাঁই দেবে না। কারো দুঃখ কষ্ট তারা বোঝে না, কারণ দারিদ্র্য-জ্বালা যে কি, তাদের তা জানা নেই। সারাটা জীবন তারা সচ্ছল অবস্থায় কাটিয়েছে। পক্ষান্তরে রত্না অতীতে যা কখনো পায়নি, মোবারক চৌধুরী তাকে সেসব অঢেল দিয়েছেন। রত্নার দুঃখ আমি বুঝি। অপরপক্ষে লীনার বুদ্ধির ওপরও আমার আস্থা আছে। ফালতু কথা বলার মেয়ে নয় সে। তাহলে কি রত্না মিথ্যা বলেছে? নাকি লীনাই কোনো কিছু গোপন করেছে? কিভাবে তা জানবো আমি?

সারাটা দিন খুব ধকল গেছে, তাছাড়া রাতেও ভালো ঘুম হয়নি। কখন যে সোফায় হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, টের পাইনি।

দশ

খুব সম্ভব কোনো একটা শব্দেই ঘুমটা ভাঙলো। প্রথমে বুঝতে পারিনি। কতোক্ষণ ঘুমিয়েছি, তাও বলতে পারবো না। হঠাৎ দেখলাম, দুটো চোখ জ্বলজ্বল করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ধড়ফড় করে বিছানার ওপর সোজা হয়ে উঠে বসলাম। দেখলাম, রোগা মতো একটি মেয়ে আমাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে। লাল রঙের একটি ফ্রক পরে আছে সে। চোখে মস্ত বড়ো চশমা। মাথার চুলগুলো ছোটো ছোটো দুটো বেণীতে ভাগ করা। দাম্ভিক গলায় সে বলে উঠলো, 'আপনি কে?'

স্মিত হেসে উত্তর দিলাম, 'আমি জাহিদ। তুমি কে?'

'আমি টিনা।'

এই তাহলে টিনা। লীনার ছোটো বোন। কতোই বা হবে বয়েস। এগারো কিংবা বারো। কিন্তু কী কুৎসিত! ঠিক তার দাদার মতো। হয়তো তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিটাও টিনা

পেয়েছে। সূক্ষ্ম কণ্ঠে বলে উঠলো, 'আপনি তো আপার বন্ধু। তাই না?'

কোনো উত্তর দিলাম না। সে আমাকে আপাদমস্তক লক্ষ্য করতে লাগলো।

'ইন্সপেক্টরের সঙ্গে আপনাকে আসতে দেখলাম। তাকে চেনেন?'

'সেও আমার বন্ধু।'

ঠোঁট উল্টালো টিনা, 'তাকে আমার মোটেও ভালো লাগে না। আর তাই, ঠিক করেছি, তাকে কিছুই বলবো না।'

'কি বলবে না?'

'অনেক কিছু,' সবজান্তার ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বললো টিনা। তার চোখ দুটো এখনো আমার মুখের ওপর যেন স্থির হয়ে আছে। মনে মনে বিরক্ত হলাম। ভাবলাম, মেয়েটা অকালে পেকে গেছে।

'আমার দাদুকে খুন করা হয়েছে। শুনেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'তাকে আইজেরিন বিষ দিয়ে মারা হয়।'

আইজেরিন শব্দটা সে অত্যন্ত স্পষ্ট এবং ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলো।

'খুব রোমাঞ্চকর ব্যাপার। তাই না?'

'মনে হয়,' মনে মনে বিস্মিত হলাম। মেয়েটা একদম বড়োদের মতো করে কথা বলছে।

'খুবই রোমাঞ্চকর,' আবার উচ্চারণ করলো সে।

'জানেন, আমি আর মাসুদ খুব ডিটেকটিভ বই পড়ি। আমি বড়ো হয়ে প্রাইভেট ডিটেকটিভ হতে চাই। একটা সুযোগ পাওয়া গেল। আমি এখন প্রমাণ খুঁজছি।'

কেন জানি, ট্রিনাকে আমি ঠিক সহ্য করতে পারছিলাম না।

'ঐ লম্বা লোকটাও পুলিসের লোক। যদিও সিভিল ড্রেস পরে থাকে। বইয়ে লেখা আছে, কোনো লোক পুলিস কিনা জানতে চাইলে, তার বিরাট জুতো দেখলে বোঝা যায়। কিন্তু ঐ লোকটা কোনো বড়ো জুতো পরে না।'

'সব কিছু বদলে যায়। পুলিসও আজকাল ছোটো জুতো পরে।'

'হ্যাঁ। সবকিছু বদলে যায়,' বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বললো সে। 'এখানেও অনেক রদবদল হবে। আমরা বোধ হয় ঢাকায় চলে যাবো। বাবা আর আপত্তি করবে না। মা আরো অনেক আগে যেতে চেয়েছিলো। কিন্তু বাবার তখন বেশি টাকা ছিলো না। জুলিয়েটের পেছনে বাবা অনেক টাকা হারিয়েছিলো।'

'জুলিয়েট।'

'হ্যাঁ। মা-র বাইক। দেখেননি?'

'না। অনেকদিন দেশের বাইরে ছিলাম কিনা।'

'খুব বেশি দিন চলেনি। ফ্লপ করেছিলো। মাকে জুলিয়েটের পার্টে মোটেও মানায়নি। দাদু জানতো ওটা ফ্লপ

করবে। উনি বলেছিলেন ওই ধরনের ড্রামা আজকাল কেউ দেখে না। তবু মা জিদ করে ওটায় অভিনয় করেছে।' একটু থেমে গেল, তারপর দুষ্টু হাসি হেসে বললো, 'কাগজে ওই বাইকের ওপর অনেক বাজে লেখালেখি হয়েছিলো। মা এতে খুব আপসেট হয়ে যায়। থালাবাসন ছুঁড়ে মারতো। তাকে ওই অবস্থায় দেখে আমি খুব মজা পেতাম, আর আড়ালে দাঁড়িয়ে হাসতাম।'

'যারা অন্যদের কষ্ট দেখে হাসে, তারাই কিন্তু বোকা।' খোঁচা মারার ইচ্ছাটা দমন করতে পারলাম না।

পাত্তা দিলো না ও আমাকে। বলে চললো, 'দাদুর লাশটা কাটা হবে। তাই না?'

'হ্যাঁ। তাঁর জন্যে তোমার মন খারাপ হয়নি?'

'না। তাঁকে আমার ভালো লাগতো না। আমাকে সবসময় নাচ শিখতে বারণ করতেন।'

'তুমি নাচ শিখতে চাও?'

'হ্যাঁ। এতে মা-বাবারও আপত্তি নেই; কিন্তু দাদুর কথার ওপর কেউ কোনো কথা বলতে পারেনি। উনি বলতেন আমাকে দিয়ে কিছু হবে না।' হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টে বললো, 'আমাদের বাড়িটা সুন্দর না?'

'হ্যাঁ।' বেশি কিছু বলতে সাহস পেলাম না।

'বোধহয় বিক্রি হয়ে যাবে। অবশ্য ছোটো দাদী যদি রাজি হয়। আবার, চাচা-চাচী হয়তো বাইরে যাবার চিন্তা বাদ দিয়ে এখানেই থেকে যাবে।'

'তারা বাইরে যাবার কথা ভাবছে না কি?'

'হ্যাঁ। মঙ্গলবারেই চলে যেতে চেয়েছিলো। বোধহয় লণ্ডনে?'

'কিন্তু আমি তো তেমন কিছু শুনিনি।'

'কেউ জানে না। কাউকে না জানিয়ে চলে যেতে চেয়েছিলো। সেখানে পৌঁছে দাদুকে চিঠি লিখে জানাতে চেয়েছিলো।'

'এখন আর যাবে না কেন? তোমার দাদু মরে গেছে বলে?'

'হ্যাঁ,' তার চোখে মুখে শয়তানী হাসি ফুটে উঠলো। 'ইণ্ডাস্ট্রির কিছু টাকা চুরি হয়েছিলো।'

'তুমি কি করে জানলে?'

আমার আরো কাছে ঘেঁষে এসে ফিসফিস করে টিনা বললো, 'দাদু যেদিন মরে যান, সেদিন চাচা তাঁর কাছে গিয়েছিলো। খুব আপসেট ছিলো। দাদুকে বলেছিলো, উনি ক্ষমার অযোগ্য একটি অপরাধ করে ফেলেছেন।'

আবার প্রশ্ন করলাম, 'তুমি তা কি করে জানলে?'

'দরজার পাশে দাঁড়িয়ে শুনেছিলাম,' খুব সহজ ভঙ্গিতে বললো সে।

'তুমি জানো না, আড়ি পেতে অন্যদের কথা শুনতে নেই!'

'কিন্তু ডিটেকটিভরা তাই করে। ইন্সপেক্টর মাহবুব সাহেবও তাই করেন। তাঁরা আমাদের গোপন কথা শোনেন।

চিঠি খুলে পড়েন। কিন্তু উনি মস্ত বোকা, কোথায় খুঁজতে হবে, জানেন না। কিন্তু আমি জানি। মাসুদ বলে, মেয়েরা নাকি কিছুই জানে না। কিছুই পারে না। কিন্তু আমি সবাইকে দেখিয়ে ছাড়বো। খুনীর পরিচয় জেনে ডায়েরীতে তার নাম লিখবো, তারপর পুলিস যখন হতাশ হয়ে পড়বে, ডায়েরীটা দেখিয়ে বলবো, এই দ্যাখো বোকার দল, খুনী কে?'

একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললাম, 'খুব ডিটেকটিভ বই পড়ো, তাই না টিনা?'

'শতো শতো।' একটু থেমে যোগ করলো, 'ইন্সপেক্টর ছোটো দাদীকে সন্দেহ করছে। তাই না। স্বাভাবিক, যেহেতু স্যারের সাথে তাঁর অ্যাফ্যায়ার আছে।'

হতভম্ব হয়ে গেলাম। এইটুকু মেয়ে...? বললাম, 'ছিঃ ছিঃ টিনা। এসব বলতে নেই। তুমি এখনো অনেক ছোটো।'

'কিন্তু সবাই জানে।'

'এতো সত্যি নাও হতে পারে!'

'ওরা দুজনে চিঠি লেখালেখি করে।'

'তুমি কি করে জানলে?' দীর্ঘশাস ছেড়ে বললাম, যদিও উত্তরটা জানা ছিলো।

'শুধু জানি না। ওগুলো আমি পড়েছিও। জানেন, অনেক রোমান্টিক কথাবার্তা লিখেছে।'

আলোচনা নিঃসন্দেহে আরো দীর্ঘ হতো। কিন্তু সেই সময় বাড়ির সামনে একটা গাড়ির আওয়াজ শোনা গেল।

টিনা দৌড়ে গিয়ে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে দেখলো, 'জামান সাহেব এসেছেন। দাদুর উকিল। নিশ্চয় উইলের ব্যাপারে কথা বলতে এসেছেন।' কথা শেষ করে আর দাঁড়ালো না। দৌড় দিয়ে চলে গেল। বুঝলাম, কোথাও গিয়ে আড়ি পাতবে।

লীনার মা ড্রয়িং রুমে এসে ঢুকলেন। আমাকে দেখে কাছে এসে কাঁধে হাত রাখলেন, 'ভালো হয়েছে, তুমি এখনো আছো। আমাদের এখন সত্যিকারের একজন শুভাকাঙ্ক্ষীর প্রয়োজন।' যদিও কথাগুলো বোধগম্য হলো না, তবু মনে মনে খুশি হলাম। হাজার হোক, উনি আমার হবু শাশুড়ী। কেন যেন সেই মুহূর্তে তাঁকে খুব নার্ভাস আর উত্তেজিত মনে হলো, এবং সেটা মোটেও অভিনয় ছিলো না। লীনা দরজা দিয়ে উঁকি দিলো, 'জামান সাহেব এসেছেন।'

তার মা মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'জানি।'

কিছুক্ষণ পর লীনা এক বেঁটেমতো ভদ্রলোকসহ ঘরে ঢুকলো। মাজেদাকে দেখেই ভদ্রলোক বললেন, 'কেমন আছেন মিসেস চৌধুরী? আপনার স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। একটু ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে সম্ভবত। উনি ভেবেছিলেন, আপনার শ্বশুরের উইলটা আমার কাছে আছে। কিন্তু আমি যতোদূর জানি, ওটা তাঁর সিন্দুকে রাখা আছে। কিন্তু আপনার স্বামী বলছেন ওটা ওখানে নেই।'

মাজেদার চোখ দুটো বড়ো বড়ো দেখালো। চেঁচিয়ে উঠলেন 'হায় খোদা। ওই শয়তানী রত্নাটাই ওটা

সরিয়েছে। জানতাম এমন হবে।'

উকিল সাহেব বোধহয় একটু বিরক্ত হলেন। বললেন, 'উনি তা করতে যাবেন কেন? মোবারক সাহেব সম্ভবত ওটা অন্য কোথাও রেখেছেন।'

'উনি উইলটা আপনারে কাছে পাঠাবেন বলেছিলেন। আমি নিজের কানে শুনেছি।'

'ওটা আমার কাছে নেই। ইন্সপেক্টর কোথায়? তার সঙ্গে কথা বলতে হবে।' এই বলে তিনি মাহবুবের খোঁজে গেলেন। মাজেদা ধপ করে চেয়ারে বসে পড়লেন, 'রত্নাই ওটা নষ্ট করেছে, কিংবা কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। বদমাশ মেয়েলোক, ছোটো লোক।'

লীনা ধমকে উঠলো, 'থামো তো, মা। এতোটা বোকা সে নয়।'

'বোকা? তুই জানিস না, ওটা না-পাওয়া গেলে কি হবে? পুরো সম্পত্তিটা সেই পাবে।'

'দোহাই তোমার মা, চুপ করো। উকিল সাহেব আসছেন।'

ইন্সপেক্টর সহ জামান সাহেব ঘরে এসে ঢুকলেন। তাদের পেছনে রহমান চৌধুরীও এসে গেলেন। জামান বললেন, 'এই একটু আগে মনে পড়লো, মোবারক সাহেব আমাকে বলেছিলেন, ওটা উনি ব্যাঙ্কে রেখে দিয়েছেন।'

মাহবুব মুখের ঘাম মুছতে মুছতে বললেন, 'কিন্তু ব্যাঙ্কে ফোন করে জানলাম. ওখানে তাঁর কোনো পার্সোনাল

কাগজপত্র নেই।'

'হয়তো রউফ সাহেব অথবা হাসিনা খালা কোনো তথ্য দিতে পারবেন। লীনা, ওদের একটু ডেকে আনবে!'

একটু পর রউফ চৌধুরী এসে জোর দিয়ে জানালেন, তাঁর বাবা উইলটা জামান সাহেবের কাছে বাই পোস্ট পাঠিয়েছিলেন।

জামান বললেন, 'উইলটা সম্পর্কে আমি তাকে একটা আইডিয়া দিয়েছিলাম, উনি সেটা পছন্দও করেছিলেন। ক'দিন পর ওটা লেখা হলে উনি তাতে সই করার জন্যে বাড়িতে নিয়ে আসেন। পরে আর কোনো খবর না পেয়ে তাঁকে ফোন করে ওটার কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম। উনি বললেন ওটায় সই করে ব্যাঙ্কে জমা দিয়েছেন।'

মাহবুব বললেন, 'উইলের বিষয়বস্তু কি ছিলো জামান সাহেব?'

উকিলকে সুযোগ না দিয়ে রউফ বলে উঠলেন, 'খুব সহজ। বড়ো দু'বোনের মৃত্যুর ফলে আমি আর রহমান বাবার প্রকৃত উত্তরাধিকারী হলাম। হাসিনা খালাকে পাঁচ লাখ আর রত্নাকে এই বাড়িটা সহ তিরিশ লাখ টাকা লিখে বাকি যা থাকে তা তিন জনকে ভাগ করে দিয়েছেন। একভাগ আমার নামে, এক ভাগ রহমানের নামে এবং তৃতীয় ভাগ রহমানের তিন ছেলেমেয়ের নামে। তাই না, জামান সাহেব?'

জামান সাহেব সায় দিলেন, 'হ্যাঁ। উইলে তাই

লিখেছিলাম।'

রউফ চৌধুরী আবার বলে উঠলেন, 'বাবা ওটা পড়ে শোনাবার পর জিজ্ঞেস করলেন, কারো কোনো অভিযোগ আছে কি না। কিন্তু আমাদের কারো কোনো অবজেকশন ছিলো না।'

হাসিনা বেগম বললেন, 'ছিলো। রত্নার ছিলো।'

মাজেদা খুশি হয়ে উঠলেন। সুযোগটা হাত ছাড়া করলেন না, 'হ্যাঁ। বলেছিলো সে কিছুই চায় না। প্রিয়জনের মৃত্যুর কথা শোনার চেয়ে তার মরণ ভালো। ডাইনী একটা।'

হাসিনা বেগমও সুর মেলালেন, 'ওর ওসব নাকী কান্না, আমার ভালোই চেনা আছে।'

মাহবুব প্রসঙ্গ পাল্টালেন, 'উইল পড়ে শোনাবার পর কি ঘটলো?'

রউফ উত্তর দিলেন, 'বাবা ওটায় সই করলেন। কখন এবং কিভাবে?'

রউফ চৌধুরী দ্বিধান্বিত হয়ে তাঁর স্ত্রীর দিকে সাহায্যের আশায় তাকালেন। সাবিনা বললেন, 'আমার শ্বশুর উইলটা টেবিলের ওপর রেখে রউফকে, তাঁর সেক্রেটারী মাহমুদকে, এবং আশরাফ সাহেব, মানে রহমানের এক বন্ধুকে ডেকে দিতে বললেন। কিছুক্ষণ পর ওঁরা এলে, উনি উইলটায় সই করেন এবং ওঁদেরকে সাক্ষীর জায়গায় সই করতে বলেন।'

ইন্সপেক্টর সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন, 'উইলটা ঠিক এভাবেই সই করা হয়েছিলো?'

সবাই সায় দিলো। তিনি আবার সাবিনার দিকে ফিরলেন, 'আপনি তখন ঠিক কোথায় বসেছিলেন?'

'টেবিলটা থেকে সামান্য দূরে।'

'সই করার আগে উনি কি টেবিল ছেড়ে কোথাও গিয়েছিলেন?'

'না।'

'সাক্ষীদের কেউ কি ওটা পড়েছিলো?'

'না। উনি ওটাকে একটি কাগজ দিয়ে ঢেকে রেখেছিলেন।'

হঠাৎ মাহবুব তার পকেট থেকে একটা বড়ো, সাদা রঙের খাম বের করে জামানের দিকে দিয়ে বললেন, 'এটা খুলে দেখুন তো।'

জামান সাহেব খামটা ধরে তার ভেতর থেকে একটি মোটা কাগজ বের করে উল্টেপাল্টে দেখলেন। অবাক হয়ে বললেন, 'আশ্চর্য। এটা কোথায় পেলেন?'

'মোবারক সাহেবের লোহার সিন্দুকে।'

রহমান চৌধুরী জিজ্ঞেস করলেন, 'কি এটা?'

জামানই উত্তর দিলেন; এখনো তাঁর মুখে বিস্ময়ের ছাপ লেগে রয়েছে, 'এই তো সেই উইলটা! আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, এতে কোনো সই নেই!'

মাহবুবকেও চিন্তিত দেখালো, 'এটা একটা কপিও হতে পারে?'

'না। এটাই আসল।'

রউফ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এ হতেই পারে না। অসম্ভব। উনি আমাদের সবার সামনে ওটায় সই করেছিলেন।'

মাহবুব জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার বাবার দৃষ্টিশক্তি কেমন ছিলো?'

'চশমা ব্যবহার করতেন। তবে সবসময় নয়। সেদিনও ওটা পরেছিলেন। এবং সই করার পর খুলে রেখেছিলেন।'

'সই করার আগে কেউ কি টেবিলের কাছে গিয়েছিলো?'

লীনা জোর দিয়ে বললো, 'না। আর দাদুও সেখান থেকে একচুলও নড়েননি।'

'অদ্ভুত ব্যাপার তো। কিন্তু এ কি করে সম্ভব। তাঁর সই করা উইলটাই বা গেল কোথায়?'

কেউ কিছু বললো না। সবার মুখ থম্‌থম্ করছে। সন্দেহের দৃষ্টিতে একে অপরের দিকে চাইলো। কেন যেন এই নিরবতা আমার কাছে অসহ্য লাগলো। বলে উঠলাম, 'এমন হতে পারে না, সইটা কেউ মুছে ফেলেছে!'

'অসম্ভব। মুছে ফেললে দাগা থেকে যেতো। এর একটি মাত্র ব্যাখ্যা থাকতে পারে, এ উইলটা সে উইল নয়।' মাহবুব ক্লান্ত ভঙ্গিতে বললেন। জামান সাহেব চেঁচিয়ে উঠলেন, 'হতেই পারে না। নিজের হাতের লেখা চিনতে কখনো ভুল হয় না কারো।'

হাসিনা বেগম বললেন, 'এখন কি করা যায়, তাই বলুন জামান সাহেব?'

'উইলটা তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী লেখা হয়েছিলো। তার

সাক্ষীও আছে। আমরা জানি, তাঁর ইচ্ছাটা কি ছিলো। কিন্তু তাঁর সই ছাড়া এর কানাকড়িও দাম নেই।'

মাহবুব তার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, 'আপনাদের বোধ হয় লাঞ্চের টাইম হয়ে গেছে।'

রহমান সাহেব বললেন, একমাত্র তাঁর কণ্ঠে উত্তেজনার কোনো চিহ্ন লক্ষ্য করলাম না। 'ইন্সপেক্টর, আপনিও চলুন। লাঞ্চ খাবেন আমাদের সঙ্গে।'

'ধন্যবাদ চৌধুরী সাহেব। আজ নয়। এখনই ঢাকায় ফিরতে হবে।'

'জামান সাহেব, আপনি?'

'হ্যাঁ। আমি থাকছি। আপনাদের সঙ্গে আমার আরো কিছু কথা আছে।'

সবাই উঠে ডাইনিং রুমের দিকে রওনা দিলো। আমি লীনার কানে কানে বললাম, 'আমার বোধ হয় চলে যাওয়াটাই ভালো।'

'আমারো তাই মনে হয়।'

এই হচ্ছে লীনা। কোনো ফর্মালিটির ধার ধারে না। যা উচিত মনে হয়, তাই বলে। তাই কালবিলম্ব না করে আমি মাহবুবের সঙ্গে ঢাকার পথে রওনা হলাম।

এগারো

পরের দিন সি. আই. ডি. অফিসে বাবার রুমে যখন ঢুকলাম, তখন ইন্সপেক্টরও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অসহায় ভঙ্গিতে দু'হাত নেড়ে তিনি বাবাকে বলছিলেন, 'দেখতেই পাচ্ছেন, এতো কষ্ট করে কোনো ফল পেলাম না। খুনী কে বা খুনের মোটিভ কি, জানা গেল না। শুধু জানলাম রত্না আর সাদিকের দৃষ্টি চলছে, তারা প্রেমে পড়েছে।' তার কণ্ঠে ব্যঙ্গ ঝরে পড়লো।

আমি বলে উঠলাম, 'আমি কিন্তু আরো অনেক কিছু জানতে পেরেছি।'

'আচ্ছা। যেমন?' মাহবুব সাগ্রহে আমার দিকে তাকালেন।

'যেমন, রউফ চৌধুরীর আগামী মঙ্গবার সস্ত্রীক লণ্ডনে চলে যাবার কথা ছিলো। ইণ্ডাস্ট্রিতে কিছু কারচুপির ঘটনা জানাজানি হলে, মোবারক এবং তাঁর ছেলের মধ্যে মৃত্যুর দিনই তর্ক-বির্তক হয় এবং ছেলে তার বাপের কাছে দোষ

স্বীকার করে।'

মাহবুবের মুখটা লালচে দেখালো, চেঁচিয়ে উঠলেন, খোদার কসম, একটা খবর বটে। কে দিলো? চাকর-বাকররা কি...?'

'না। একজন শখের গোয়েন্দা তথ্যটা দিলো।'

মাহবুবের মুখটা হাঁ হয়ে গেল। বাবা সোজা হয়ে তাঁর আসনে বসলেন, মুখে কৌতুকের চিহ্ন ফুটে উঠলো। তাঁদের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলাম, 'বইয়ে তো তাই থাকে। পুলিস কিছুই করতে পারে না। অথচ ছোটোখাটো এক ডিটেকটিভ সবই জানতে পারে। আমার এই বন্ধুটি আরো অনেক কিছু জানে।'

মাহবুব বোধহয় কিছু বলতে চাইলেন, কিন্তু কি ভেবে চুপ করে গেলেন। বুঝতে পারলাম, কৌতূহলে ভদ্রলোক ফেটে পড়ছেন। আবার আমাকে জিজ্ঞেস করতেও তাঁর আত্মসম্মানে বাধছে। অবশেষে বললেন, 'রউফ চৌধুরীই তাহলে খুনী।'

টিনা যা যা বলেছে সবই তাঁকে জানালাম। যদিও মনে মনে অনুশোচনা হচ্ছিলো। রউফকে ধরিয়ে দেবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিলো না আমার। কিন্তু এছাড়া কোনো উপায়ও নেই।

বাপের অজান্তে তাঁর টাকা আত্মসাৎ করা, তাঁকে না জানিয়ে বিদেশে চলে যাবার প্রস্তুতি, সবই তার বিরুদ্ধে জোরালো প্রমাণ।

বাবা বললেন, 'আমাদের প্রথমে জানতে হবে, ইণ্ডাস্ট্রির

বর্তমান অবস্থাটা কেমন?'

মাহবুব বললেন, 'কারচুপি ঘটলে আমরা সেটা জানতে পারবো এবং তখন তাকে ধরতে কোনো বাধা থাকবে না। আর মোটিভ তো জানাই হয়ে গেল। মোবারক চৌধুরী সব জানতে পেরে ছেলেকে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁকে চোর বলে অপমান করলেন কিংবা পুলিসে দেবেন বলে শাসালেন। রউফ রেগে গিয়ে তাঁর বাবার ঘর থেকে বের হলেন এবং পরে ফিরে এসে বাথরুমে ঢুকলেন। সেখানে ইনস্যুলিনের শিশি খালি করে ওটায় আইজেরিন ভরে রাখলেন। অথবা হয়তো তাঁর স্ত্রীই তাঁর হয়ে কাজটা করলেন। স্বামীর জন্য এটুকু করতে তাঁর বাঁধবে না।'

বাবা যোগ করলেন, 'আর স্বামীকে বাঁচানোর জন্য মেয়েরা সবই করতে পারে।'

পরদিন বাবার ডাক পেয়ে তাঁর অফিসে গিয়ে দেখি উৎফুল্ল অবস্থায় সেখানে ইন্সপেক্টরও উপস্থিত। আমাকে দেখে বললেন, 'ইণ্ডাস্ট্রির বর্তমান অবস্থা খুব খারাপ। শেয়ার হোল্ডারদের টাকা ফেরৎ না দিলে ওটা ক'দিনের মধ্যে বাজেয়াপ্ত হবে।'

বাবা ঘড়ি দেখে বললেন, 'তাকে আসতে বলেছি। এখনই এসে পড়বে।'

'কে? রউফ চৌধুরী?'

'হ্যাঁ।'

কেন যেন হঠাৎ মাছিকে মাকড়সার আমন্ত্রণ জানানোর গল্পটা মনে পড়লো। রউফের জবানবন্দী নেয়ার জন্যে ঘরের কোণে সার্জেন্ট খলিলকেও বসে থাকতে দেখলাম। ঠিক সময়ে রউফ এলেন। ঘরে প্রবেশ করে বলে উঠলেন, 'কি ব্যাপার ইন্সপেক্টর? নতুন কোনো তথ্য পেলেন। ওহ্...জাহিদ, তুমিও আছো। কেমন আছো?'

বাবাই কথা বললেন, 'বসুন চৌধুরী সাহেব। আমাদের কিছু কথা জিজ্ঞেস করার ছিলো। তবে আপনাকে জানানো আমার কর্তব্য। আপনার জবানবন্দী লিখিত ভাবে গ্রহণ করা হবে। ইচ্ছে করলে আপাতত উত্তর দিতে অস্বীকার করতেও পারেন। আর আপনার উকিলকেও ডেকে পাঠাতে পারেন।'

রউফের মধ্যে কোনো ভাবান্তর হলো না। কাঁধ ঝাঁকিয়ে তিনি বললেন, 'উকিলের, তাঁর কোনো প্রয়োজন নেই।'

বাবা বললেন, 'কোনো নতুন তথ্য জানানোর জন্য আপনাকে ডেকে পাঠাইনি মি. চৌধুরী। বরং ডেকেছি, আপনি আমাদের কাছে যা গোপন করেছেন, তা বলার জন্যে।'

রউফের মুখটা লাল হয়ে উঠলো, 'আমি কিছুই গোপন করিনি।'

'করেছেন। মৃত্যুর দিন আপনার বাবার সঙ্গে দেখা করেছিলেন।'

'সেই কথাটা তো আপনাদের কাছে বলেছি।'

'হ্যাঁ। কিন্তু আলোচনার বিষয়বস্তু কি ছিলো, তা বলেননি।'

'সাধারণ কথাবার্তা।'

'ইণ্ডাস্ট্রির ব্যাপারে কোনো কথা হয়নি?'

সেই মুহূর্ত পর্যন্ত মনে আশা ছিলো টিনা হয়তো মিথ্যা বলেছে। কিন্তু রউফ সাহেবের ফ্যাকাসে মুখ এবং তাঁর পরবর্তী কথাগুলো শুনে নিরাশ হলাম। 'হায় খোদা…। কি করে জানলেন?'

মাহবুবের মুখে একটি সূক্ষ্ম হাসির রেখা দেখা দিলো। যেন ভাবছেন, এইতো শিকার জালে ধরা পড়েছে। বাবা বললেন, 'পুলিস তার কাজ জানে। এখন মি. চৌধুরী, আমাদের কাছে সব কথা খুলে বলবেন কি?'

'হ্যাঁ। বলবো। কি জানতে চান, বলুন?'

'ইণ্ডাস্ট্রির অবস্থা কতোটা খারাপ? ওটা কি সত্যি যে কোনো সময় উঠে যাবে?'

'হ্যাঁ। দুঃখ একটাই, বাবা মৃত্যুর আগে সেই কথা জানতে পেরেছিলেন।'

এর ফলে কি পরিবারের কোনো ক্ষতি হবে?'

'না। শেয়ার হোল্ডাররা তাদের টাকা ফেরত পাবে। দরকার হলে আমার সব কিছু বিক্রি করে ধার দেনা শোধ করবো। আমার ভাই বা অন্য কারো কোনো ক্ষতি হবে না। এটা আমার একার দায়িত্ব। বাবা আমাকে বিশ্বাস করে ওই ইণ্ডাস্ট্রির দায়িত্ব দিয়েছিলেন। অথচ আমি তার বিশ্বাসের অযোগ্য ছিলাম।' রউফ চৌধুরীর চোখ পানিতে ভরে উঠলো। হঠাৎ করে যেন তাঁর বয়সটা দ্বিগুণ বেড়ে গেল। বাবা

জিজ্ঞেস করলেন, 'কারো যখন কোনো ক্ষতি হতো না, তখন স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন কেন?'

'এটাও জেনে ফেলেছেন?' রউফ সাহেবকে খুবই বিস্মিত মনে হলো। 'ঠিক আছে, খুলেই বলছি। প্রথমে বাবাকে জানাতে চাইনি। কারণ জানালে উনি আমাকে বাঁচানোর জন্য সব রকম ব্যবস্থা নিতেন। আরো টাকা খরচ হতো। কিন্তু সেটা আমি চাইনি। ইণ্ডাস্ট্রির আর কোনো আশা নেই। সাময়িক ভাবে ওটাকে হয়তো বাঁচানো যেতো, কিন্তু ফের ডুবতো। ওটাকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টার কোনো ত্রুটি করিনি। তাই আমার স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করে ঠিক করলাম, কাউকে না জানিয়ে সরে পড়বো। অবশ্যই সবার দেনা শোধ করার পর। ভেবেছিলাম নতুন দেশে গিয়ে আবার নতুন করে সব শুরু করবো।'

বাবা বললেন, 'মত পাল্টে ফেললেন কেন?'

'দুঃখিত। বুঝলাম না?'

'আমি জানতে চাই, পরে আপনার বাবার কাছে গিয়ে সাহায্য চাইলেন কেন?'

'সাহায্য? আমি কোনো সাহায্য চাইনি। বাবাই সেদিন আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। যে ভাবেই হোক, তিনি ব্যাপারটা জানতে পেরেছিলেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ঘটনাটা সত্যি কি না, আমি সবই স্বীকার করলাম।' ঢোঁক গিলে রউফ বলে গেলেন, 'ভেবেছিলাম, গালাগালি দেবেন, তিরস্কার করবেন। করেননি। আমাকে খুব স্নেহ করতেন।

কোনো কথাই শুনলেন না। বললেন, "তোর কোথাও চলে যেতে হবে না। যেভাবেই হোক ইণ্ডাস্ট্রিকে আমি বাঁচাবো"।'

বাবা কঠোর ভাষায় বলে উঠলেন, 'আপনার বাবা আপনাকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন, কথাটা বিশ্বাস করতে বলছেন?'

'হ্যাঁ। কারণ কথাটা সত্যি। এ ব্যাপারে তিনি ব্যাঙ্কের কাছে চিঠি লিখে কিছু নির্দেশও দিয়েছিলেন।'

আমাদের দৃষ্টিতে অবিশ্বাস দেখতে পেয়ে বলে উঠলেন, 'চিঠিটা বোধহয় এখনো আমার পকেটেই আছে। তাঁর মৃত্যুর ফলে সবকিছু উলটপালট হয়ে গেল। ওটা পাঠানোর কথা মনে ছিলো না। এই দেখুন।'

মানিব্যাগ থেকে একটি চিঠি বের করে তিনি বাবাকে দিলেন। বাবা ওটা পড়ে মাহবুবের হাতে দিলেন। পড়ে জানতে পারলাম উনি সত্যি কথাই বলেছেন। তাঁর বাবা চিঠিতে ব্যাঙ্ককে ইণ্ডাস্ট্রির নামে একটি বড় অঙ্কের টাকা পাঠানোর জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। অর্থাৎ চৌধুরী সাহেব মিথ্যা বলেননি যে, তাঁর বাবা তাঁকে বাঁচানোর ব্যাপারে অটল ছিলেন। মাহবুব চিঠিটা দেখিয়ে বললেন, 'এটা আমাদের কাছে থাক। আপনাকে একটি রসিদ দিচ্ছি।'

রউফ চৌধুরী উঠে দাঁড়ালেন, 'আর কিছু জিজ্ঞেস করার আছে?'

রসিদ দিতে দিতে মাহবুব বললেন, 'চিঠি নেবার পর কি করলেন?'

'নিজের ফ্ল্যাটে গেলাম এবং আমার স্ত্রীকে সব খুলে বললাম।'

'আপনার বাবার বাথরুমে ঢোকেননি?'

'না।' রউফ সাহেব একটু থমকে দাঁড়ালেন, হাতের মুঠো শক্ত হলো, 'আপনি কি বলতে চান?'

পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাচ্ছে বুঝতে পেরে বাবা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন। রউফ চৌধুরীর কাঁধে হাত রেখে তাঁকে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন, 'কিছু মনে করবেন না চৌধুরী সাহেব। তথ্যগুলো আরো আগে দিলে অনেক উপকৃত হতাম। যাই হোক, অসংখ্য ধন্যবাদ।'

রউফ সাহেব চলে গেলে চিঠিটা খুলে পড়লাম। মাহবুব এখনো আশা ছাড়তে নারাজ, 'চিঠিটা হয়তো জাল।'

বাবা উত্তর দিলেন, 'মনে হয় না। তাছাড়া মোবারক চৌধুরীকে যতোদূর চিনলাম, তাতে উনি অন্য কিছু করলেই বরং অবাক হতাম। ছেলের বিপদে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার লোক ছিলেন না তিনি। কাজেই দেখতেই পাচ্ছো, বাপকে খুন করার পেছনে রউফের কোনো মোটিভ নেই। বরং এতে তার ক্ষতিই হয়েছে।' হঠাৎ বাবা থেমে গেলেন। কোনো একটা ব্যাপার তাকে চিন্তিত করে তুলেছে। ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলেন, 'মোবারক যদি আরেকটা দিন বেঁচে থাকতেন, তাহলে রউফ দুর্নামের হাত থেকে রেহাই পেতেন এবং ইণ্ডাস্ট্রিও টিকে থাকতো। কিন্তু তা হলো না। খুনী সেটা

হতে দেয়নি। ঠিক এক কি দু'ঘন্টার মধ্যে মোবারক নিহত হলেন।'

মাহবুব বললেন, 'আপনি বলতে চান, খুনী এমন এক-জন যে, রউফের সর্বনাশ ঘটাতে চেয়েছিলো।'

বাবা যোগ করলেন, 'অথবা সে এমন একজন, যে চাইছিলো না, বুড়োর টাকার পরিমাণ কমে যাক। ইণ্ডাস্ট্রি বাঁচানোর জন্য মোবারক চৌধুরী লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করতে যাচ্ছিলেন। খুনী যেভাবেই হোক সেটা জানতে পারে এবং তাতে বাধা দেয়। ভালো কথা, উইলটা হারিয়ে যাওয়াতে কার বেশি লাভ হলো।'

'রত্না চৌধুরীর।'

বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'ঘুরে ফিরে সেই একই পয়েন্টে ফিরে যাচ্ছি।'

বাবার অফিস ছেড়ে চলে যাবার আগে বাবা আমাকে বললেন, 'জাহিদ, তুমিই আমাদের একমাত্র ভরসা। লোকগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তোলো। পুলিসের কাছে না বললেও তোমার কাছে ওরা অনেক কথা বলতে পারে।'

নিজেকে আবারো একজন জঘন্য গুপ্তচর মনে হলো। ওরা লীনারই পরিবারের সদস্য। ওদের আমি এভাবে ঠকাতে পারি না। বাবা বোধহয় আমার মনের দ্বিধাটা বুঝতে পারলেন। বললেন, 'দেখো, তোমার আর লীনার ভালোর জন্য খুনীর পরিচয় জানা দরকার। আরেকটা কথা, ছোটো মেয়ের দিকে খেয়াল রেখো। ওর বিপদ হতে পারে।'

'টিনা...?'

'হ্যাঁ। মেয়েটা অনেক কিছু জানে। আর সম্ভবতঃ খুনীও সেটা জানে। মেয়েটা ইচ্ছা করলে আমাদের আরো অনেক তথ্য দিতে পারবে। আমার ব্যক্তিগত অভিমত, বড়দের চেয়ে ছোটোরা অনেক সাহায্য করতে পারে। তার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো। তাকে কোনো প্রশ্ন করো না। আমার মনে হয়, সে নিজেই তোমাকে অনেক কথা বলতে চায়। কথা বলার জন্যে তাকে উৎসাহিত করো আর মাঝেমাঝে তার বুদ্ধির তারিফ করবে। তবে তোমার আসল কাজ হবে তার নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রাখা।

বারো

বাবার অফিস থেকে বেরিয়ে রাস্তায় হাঁটতে লাগলাম। মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিলো নানা চিন্তা। রউফ চৌধুরীর ব্যাপারটা বললেও, রত্না আর সাদিকের মধ্যে চিঠি আদান-প্রদানের কথাটা বাবা আর মাহবুবের কাছে চেপে গিয়েছিলাম। তার কারণ নিজের কাছেও পরিষ্কার নয়। হয়তো ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে মন চাইছিলো না। আবার হয়তো, আমার কারণে রত্নার কোনো ক্ষতি হোক, সেটা চাইছিলাম না। তাছাড়া সত্যি সত্যি ওরকম কোনো চিঠিপত্র থাকলে মাহবুব আর তার লোকজন একসময় ওগুলো খুঁজে পাবে। কাজেই এ নিয়ে ভাবাভাবি না করলেও চলে। রত্না হলফ করে বলেছে তার সঙ্গে সাদিকের কোনো রকম সম্পর্ক নেই। ঐ খুদে শয়তান টিনার চেয়ে রত্নার কথাই বিশ্বাস করতে মন চাইলো।

একটি ট্যাক্সি ভাড়া করে জয়দেবপুরের দিকে রওনা হলাম। তিন মিনারে পৌঁছে মেইন গেটটা খোলা অবস্থায়

পেলাম। বাগানের সরু পথটা পার হয়ে বাড়ির দিকে যাচ্ছি, এমন সময় পেছন দিকে একটি শব্দ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম। দেখলাম, টিনা একটি লাল টকটকে আপেল হাতে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। আমার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকালো। গাল দুটো সে আপেলের টুকরো দিয়ে ভরে রেখেছে। তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, 'কেমন আছো টিনা?'

কোনো উত্তর দিলো না সে। বাগানের এক কোণায় গিয়ে একটি কাঠের বেঞ্চে বসে পড়লো। বেঞ্চের পাশে একটি রঙিন মাছের অ্যাকোয়ারিয়াম দেখতে পেলাম। ছোটো বড় বিভিন্ন ধরনের মাছ ওটায় সাঁতার কাটছে। ওর পাশে বসে পড়লাম। কিন্তু ও আমাকে কোনো পাত্তা দিলো না। ছোটো ছোটো পা দুটো অবহেলায় দোলাতে লাগলো।

'কেমন আছো টিনা?'

এবারো কোনো উত্তর দিলো না। সাদা ঝকঝকে দাঁত বসিয়ে আপেলটায় কামড় বসালো। বিরক্ত বোধ করলাম তবু ধৈর্য হারালাম না। 'আপেলটা খুব মিষ্টি। তাই না?'

এতোক্ষণে কথা বলে উঠলো সে, 'হ্যাঁ।'

'কেমন আছো জিজ্ঞেস করেছিলাম। উত্তর দাওনি কেন?'

'আপনাকে আমার মোটেও ভালো লাগে না।'

'কেন?'

'কারণ আপনি পুলিসের কাছে মুখ খুলেছেন।'

অবাক হলাম। কিছুটা লজ্জিতও বটে। বললাম, 'সবার

ভালোর জন্যেই কাজটা করেছি। যাই হোক, বড় চাচা তো নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছেন।'

আমার দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, 'আপনি আসলে একটি বোকা।'

মনে মনে রেগে গেলেও তাকে কিছু বললাম না। ওকে রাগানো চলবে না।

'বড় চাচা নির্দোষ কি না, তাতে আমাদের কিছু আসে যায় না। রাগ করেছিলাম কারণ, আপনি আমার প্ল্যান আরেকটু হলেই ভণ্ডুল করে দিয়েছিলেন। আমি পুলিসকে সারপ্রাইজ দিতে চাই। সবকিছু আগেভাগে বলে দিলে আমার কোনো কৃতিত্ব থাকবে না।'

'সরি টিনা, এমন ভুল আর হবে না।'

'আপনার উপর আমি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি।'

আরেকবার তার কাছে মাফ চাইলাম। এবার যেন সে কিছুটা নরম হলো। মুখে দুষ্টু হাসি দেখা দিলো ওর।

'আজ রাতে না, খুব মজা হবে। একটি মিটিং হবে। তাতে বাবা-মা, চাচা-চাচী, হাসিনা দাদীও থাকবে। হাসিনা দাদী তাঁর সম্পত্তির ভাগটা বড় চাচাকে দিতে চান। কিন্তু বাবা রাজি না। বলছেন, ওটা চাচার সমস্যা, তাঁকেই সমাধান করতে হবে। আসলে মার ভয়ে বাবা একথা বলছে। মা বাবার টাকা দিয়ে একটি নতুন নাটক করতে চায়। দারুণ মজার নাটক, প্রচুর খুনোখুনি আছে।'

অভিভূত হলাম। মেয়েটা সত্যি অনেক খবরই রাখে।

'আচ্ছা টিনা। তুমি বলছো, খুনীর পরিচয় তুমি জানো, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'আমাকে তার নাম বলবে?' বলেই বুঝলাম ভুল করে ফেলেছি। অতো সহজে সে মুখ খুলবে না। আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো শুধু; কিছু বললো না।

'ঠিক আছে। বলতে না চাইলে বোলো না। আমি কিন্তু মাহবুবের কাছে আর কিছু বলবো না।'

'প্রমাণ খুঁজছি। চিঠি পত্রের বাণ্ডিল।'

'কোন্ চিঠি পত্র?'

'ছোটো দাদী আর স্যারের চিঠি।'

'আমার বিশ্বাস হয় না ওরকম কোনো চিঠি পত্র আছে।' টিনা কিছু বলার আগে হঠাৎ করে আমি পেছনে ফিরে তাকালাম। মনে হলো, একটি শব্দ শুনেছিলাম। কারো পায়ের তলায় কোনো শুকনো পাতার পিষ্ট হবার শব্দ। চারদিকে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেলাম না। বললাম, 'টিনা। তুমি বোধহয় ভুল করছো।'

চালাক মেয়ে। ফাঁদে পা দিলো না। চুপ করে বসে থাকলো। আশা ছেড়ে দিলাম। উঠে দাঁড়িয়ে তাকে বললাম, 'তোমার আপার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। ওঠো, তুমিও যাবে।'

'না।'

'ওঠো টিনা। জেদ কোরো না।' হাত ধরে জোর করে

ওকে ওঠালাম। বিস্মিত হলেও কোনো জোড়াজুড়ি করলো না। আমার পিছে পিছে বাড়িতে ঢুকে পড়লো। কোনো কিছু না ভেবে কাজটা করেছিলাম। পরে উপলব্ধি করলাম, ঐ শুকনো পাতার শব্দটাই আসলে আমাকে ভীত করে তুলে-ছিলো। বাগানে এমন একজন ছিলো, যে আড়ি পেতে আমাদের কথা শুনছিলো। এবং আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রীয় বলছে, বন্ধু না হয়ে লোকটার শত্রু হবার সম্ভাবনাই বেশি ছিলো।

তেরো

হল রুমের কাছাকাছি পৌঁছতেই কারো কথাবার্তার শব্দ কানে এলো আমার। সম্ভবত কোনো পারিবারিক বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিলো। ভাবলাম, এখনই ভেতরে যাওয়া ঠিক হবে না। লীনাকে খুঁজতে রান্না ঘরের দিকে গেলাম। দরজার কাছে পৌঁছে একজন মোটা মতো বয়স্কা মহিলাকে দেখতে পেলাম। আন্দাজ করলাম, এই হচ্ছে সেই খোদেজা। আমাকে দেখে ডেকে বললো, 'আপনি লীনা আপার বন্ধু না? ভিতরে আসুন। চা বানাচ্ছিলাম, এক কাপ দেবো?'

রাজি হলাম। মহিলাকে ভালোই লাগলো। একেবারে অশিক্ষিত নয়। বেশ সহজ সরলও। রান্না ঘরের মধ্যখানে একটা টেবিল রাখা ছিলো। ওটার পাশে গিয়ে একটা চেয়ার টেনে বসলাম। খোদেজা এক কাপ চা আর একটা পিরিচে কয়েকটা বিস্কুট আমার সামনে এনে রাখলো। আমার দিকে তাকিয়ে আন্তরিকভাবে হাসলো, 'লীনা আপা এখনই এসে পড়বে। বেচারিকে সব কিছু দেখাশোনা করতে হচ্ছে। বড়

বিবি সাহেব তো স্কুল কলেজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। আর মেজো বিবি সাহেব খালি নাটক করে বেড়ায়। হাসিনা আপা না থাকলে এবাড়িতে একঘন্টাও থাকতাম না।'

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়লো, 'টিনা কোথায় গেল? আমার সঙ্গেই তো বাড়িতে ঢুকলো সে।'

খোদেজা ঠোঁট ওল্টালো। 'কি জানি কোথায় থাকে, কি করে। ওর তো একটাই কাজ, সারাক্ষণ দরজায় দরজায় কান লাগিয়ে মানুষের কথা শুনে আর ছোটো একটা খাতায় কি সব যেন লেখে। ওকে অনেক আগেই হোস্টেলে পাঠানো উচিত ছিলো। হাসিনা আপাও বলেছিলো। কিন্তু তাঁর দাদা রাজি হননি!'

'নিশ্চয় ওকে খুব ভালোবাসতেন?'

'উনি তো সবাইকে ভালোবাসতেন। খুব ভালো মানুষ ছিলেন।'

এমন সময় লীনা এসে রান্না ঘরে ঢুকলো, 'জাহিদ? কখন এলে?'

খোদেজা কাপ পিরিচ ধুয়ে রান্না ঘর ছেড়ে চলে গেল। লীনা এসে আমার পাশে বসলো, মুখটা পুরোপুরি ফ্যাকাসে হয়ে আছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'কি ব্যাপার? তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন?'

'ভীষণ ভয় হচ্ছে আমার, জাহিদ। যখনই ভাবি এ বাড়িতে একজন খুনী নিশ্চিন্ত মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে; সে আমাদেরই একজন; তার সঙ্গে প্রতি[illegible] আমরা কথা বলছি.

একই টেবিলে বসে খাচ্ছি?...আমার মুখের দিকে চেয়ে হয়তো সে মিষ্টি করে হাসছে, তখন আতঙ্কিত হয়ে যাই। দিশেহারা বোধ করি। বিশ্বাস করো, দাদুর মৃত্যুর পর থেকে এক মুহূর্তের জন্যে চোখের পাতা এক করতে পারিনি।'

চুপ করে বসে থাকলাম। কি বলে যে ওকে সান্ত্বনা দেবো, তা বুঝতে পারলাম না। সে বললো, 'আরো ভয় লাগে যখন ভাবি, খুনীর পরিচয় হয়তো কখনো জানা যাবে না।'

'হ্যাঁ, ভয়ঙ্কর বটে। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ায় জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা বলোতো, এই বাড়িতে আইজেরিনের ব্যাপারটা কে কে জানতো? বলতে চাই আইজেরিন যে এতোটা মারাত্মক ওষুধ সেটা কে কে জানতে পারে?'

'আমার মনেও প্রশ্নটা জেগেছিলো। কোনো লাভ নেই। আসলে আমরা সবাই এসব ব্যাপারে কম বেশি জানি।'

'কিন্তু...'

'ঠিক আছে, শোনো, প্রায় মাস খানেক আগের ঘটনা। একদিন ডিনারের পর দাদুর সাথে বসে আমরা সবাই কফি খাচ্ছিলাম। এমন সময় দাদুর বাঁ চোখটা ব্যথা করছে বলে তিনি জানালেন। রত্না আইজেরিন আইড্রপের শিশিটা এনে তাঁর চোখে দু'ফোটা দিলো। সাধারণত সে সব ব্যাপারেই একটু বেশি কৌতূহল দেখাতো। শিশির ওপর লেখা ছিলো, ওটা শুধু ড্রপ হিসেবে ব্যবহার করতে হয়, সেবন বা

ইন্‌জেকশন হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। রত্না জিজ্ঞেস করলো, "এর অর্থ কি?" দাদু তাকে ব্যাখ্যা করে বললেন। তখন সে জিজ্ঞেস করলো, "কেউ যদি ভুল করে ওটা খেয়ে ফেলে তার কি হবে?" দাদু হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, "বোকা মেয়ে। লোকটা সোজা মরে যাবে। কাজেই সাবধান, তুমি যদি কখনো ভুল করে আমাকে ইন্সুলিনের বদলে আইজেরিন ইন্‌জেকশন দাও, তাহলে আমিও সঙ্গে সঙ্গে মরে যাবো।" আমরা সবাই তখন ওখানে ছিলাম।'

হতাশ হলাম। ভেবেছিলাম, এবাড়িতে হয়তো দুই বা তিনজন মানুষ পাবো, যারা আইজেরিনের মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার কথা জানে, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, বুড়ো নিজেই তাকে মেরে ফেলার একটি সহজ উপায় সবাইকে দেখিয়ে গেছেন।

'বেচারা দাদু, তখন কি আর জানতেন, একজন খুনী সুযোগের অপেক্ষায় বসে আছে,' বললো লীনা।

'একটা ব্যাপার কিন্তু স্পষ্ট হয়ে গেল আমার কাছে।'

'কি...?'

'রত্না খুনী নয়। কারণটা খুব পরিষ্কার। যেহেতু দাদুর কথা তোমরা সবাই শুনেছো, কাজেই স্বাভাবিক ভাবে খুনী হিসাবে তাকেই প্রথমে সবাই সন্দেহ করবে। তাই খুন করতে চাইলে সে কখনো ওই পদ্ধতিতে কাজ করবে না।'

'কি জানি। হয়তো তার মাথায় এতোটা বুদ্ধি নেই।'

'তবু এতোটা নির্বোধ সে নয়।'

'আসলে তুমি মনে মনে আশা করছো, রত্না যেন খুনী না হয়। তাই না?' লীনা ভালো করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন খুঁজলো।

প্রতিবাদ করলাম না। যা খুশি ও ভাবুক। আমি কখনো কোনো অন্যায় সমর্থন করবো না। রত্নার বেলায়ও করবো না। রাগ করুক আর যাই করুক।

এরপর অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকলাম, লীনার সাথে আর কোনো কথা হলো না। সেও মুখ ফিরিয়ে বসে থাকলো। খোদেজা আসায় খুশি হলাম। আমাদের দুজনের চেহারা দেখে বোধহয় ব্যাপারটা সে আন্দাজ করলো, বললো, 'খুন খারাবির কথা বাদ দাও তো, লীনা আপা। ওটা পুলিসের কাজ।'

লীনা চেঁচিয়ে উঠলো, 'খোদেজা, বাড়িতে একজন খুনী আছে।'

'দুর। বাইরের কারো কাজ ওটা। আমার মনে হয় কোনো চোর বাড়িতে ঢুকে খুনটা করেছে।'

'চোর? চোর ওভাবে খুন করে না বুয়া। তাছাড়া বাড়ি থেকে কোনো কিছু চুরিও হয়নি।'

'কি জানি বাপু। কিন্তু খুনী এবাড়ির কেউ হতে পারে না।'

পরিস্থিতি কিছুটা হাল্কা হলো। লীনার দিকে তাকিয়ে আমি মৃদু হাসলাম। সেও লজ্জিত হাসি উপহার দিলো আমাকে।

'হলরুমে চলো। একটু পর একটা মিটিং হবে।'

'কিন্তু লীনা, ওখানে থাকা আমার মোটেও উচিত হবে না।'

'কে বললো? সবাই আমাদের সম্পর্কের কথা জানে। আমি মনে করি তোমার ওখানে থাকা উচিত।'

লীনা বরাবরই এমন, সাহসী এবং আত্মবিশ্বাসী। বললাম, 'কিন্তু মিটিং কেন?'

'বোধহয় বড় চাচার জন্য।'

হলরুমের কাছাকাছি পৌঁছে কথোপকথনের আওয়াজ শুনতে পেলাম। কিন্তু আমাদের ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সবাই নিরব হয়ে গেল। আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকলো ওরা। খুব সঙ্কোচ বোধ করলাম আমি। ভাবলাম, কেটে পড়ি, কিন্তু লীনা আমাকে জোর করে একটি চেয়ারে বসিয়ে দিলো। চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম, সবাই উপস্থিত আছে। রহমান এবং রউফ চৌধুরী পাশাপাশি একটি সোফায় বসে আছেন, দুজনের মুখ থমথমে, গম্ভীর। সাবিনা তার স্বামীর পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন। হাসিনা খালা এক কোণায় বসে উল বুনছেন। মাজেদা আর মাসুদকেও বসে থাকতে দেখলাম, দুজনের মুখে অসন্তোষের ছাপ লক্ষ্য করলাম আমি। আমাকে দেখে রহমান সাহেব লীনাকে বললেন, 'লীনা আমরা এখন একটি পারিবারিক ব্যাপারে কথা বলবো।'

চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালাম, কিন্তু লীনা বলে উঠলো, 'বাবা, জাহিদের সঙ্গে খুব শীঘ্রই আমার বিয়ে হবে। কাজেই ও আমাদের একজন।'

রউফ চৌধুরী উঠে এসে আমার একটি হাত ধরলেন, 'নিশ্চয়। তুমি বোসো জাহিদ। রহমান, তোমাকে তো বলেছি, ব্যাপারটা এখন আর গোপন কিছু নয়। কাজেই ও থাকুক, কোনো অসুবিধা নেই।' আমার দিকে ফিরে বললেন, 'তাছাড়া তুমি তো সেদিন তোমার বাবার অফিসে ছিলে। সবই শুনেছো।'

তবু চলে যেতে চেয়েছিলাম; কিন্তু লীনা জোর করে আবার বসিয়ে দিলো। হাসিনা খালা বললেন, 'আমি মনে করি, তোমাদের বাবা যা করতে চেয়েছিলেন তাই করা উচিত। রউফকে সাহায্য করতে হবে। এটাই দুলাভাইয়ের ইচ্ছা ছিলো। আমার যা আছে, সবই রউফকে দিয়ে দেবো।'

রউফ সাহেব চেঁচিয়ে উঠলেন, 'তা হয় না হাসিনা খালা।'

রহমান সাহেব অনুত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'আমিও তাই করবো। বলে ঠিক করেছি।'

'না রহমান। আমি কারো টাকা নিতে পারবো না।'

মাজেদা আর চুপ করে থাকতে পারলেন না, 'বড় ভাই তো তাঁর সম্পত্তির অংশ পাচ্ছেন। আমার মনে হয় ওটা পেলে তার আর কারো টাকা নেবার প্রয়োজন হবে না।'

লীনা বলে উঠলো, 'সম্পত্তির জন্য বসে থাকলে ইণ্ডাস্ট্রি বাঁচানো যাবে না।'

রউফ চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন, 'গোল্লায় যাক ইণ্ডাস্ট্রি। ওটার পেছনে আর টাকা খরচ করার কোনো মানে

হয় না।'

তাঁর ভাই ধমকে উঠলেন, 'কি বলছো আবোল তাবোল। শুধু নিজের কথা ভাবলে। পরিবারের সম্মান, বাবার পরিশ্রমের কথা ভুলে গেলে।'

'না। ভুলিনি। কিন্তু ইণ্ডাস্ট্রিটা এখন আর পরিবারের নামে নেই। বাবা ওটা আমার নামে লিখে গেছেন। ওটার দায়িত্ব আমার।'

হাসিনা বেগম ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন, 'ঠিক আছে রউফ। যা ভালো মনে হয় তাই করো। তবে এতোটুকু জেনে রাখো, আমরা সবাই তোমার সঙ্গে আছি।'

সবাই উঠে দাঁড়ালো। আমিও। রউফ চৌধুরী ভাইয়ের হাত ধরে যেতে যেতে বললেন, 'রহমান, লক্ষ্মী ভাইটি, তুই কি করে ভাবলি আমি তোর টাকা নেবো। তোর সংসার আছে না? ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে, তাদের খরচও বাড়ছে।'

মাজেদা, মাসুদ আর লীনাও চলে গেল। যাবার আগে লীনা বললো আমার জন্য সে একটা বেডরুমের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছে, কারণ রাত অনেক হলো। এখন ঢাকায় ফিরে যাওয়া ঠিক হবে না। হাসিনা খালা আমার দিকে একবার আড়চোখে তাকালেন। মনে হলো কিছু বলবেন, কিন্তু মত পাল্টে তিনিও চলে গেলেন। কেবল সাবিনা চৌধুরী থেকে গেলেন। তার পাশে গিয়ে বসলাম। আমাকে দেখে হাসলেন। 'মিটিংয়ের বুদ্ধিটা মাজেদার মাথা থেকে বেরিয়েছিলো। তার কাছে ওটা নাটকের একটি উত্তেজনাকর মুহূর্ত ছাড়া আর

কিছুই ছিলো না। খোদার কাছে হাজার শোকর, আমারই জয় হলো।

'অনুত্তেজিত স্বরে কথা বলে চলেছেন তিনি। আমার দৃষ্টিতে বিস্ময় দেখতে পেয়ে বললেন, 'অবাক হয়েছো, তাই না? ভেবেছিলে আমরা ওদের টাকা নেবো। না। আমরা চলে যেতে চাই। কোনো ইণ্ডাস্ট্রি চালাবার জন্য রউফ জন্মায়নি। সে পাখি, গাছ, ফুল খোলা আকাশ ভালোবাসে। কিন্তু তার বাবাকে রাগাতে চায়নি; তাই ইণ্ডাস্ট্রির দায়িত্ব নিয়েছিলো। স্বীকার করি, আমার শ্বশুর তাকে ঐ ব্যাপারে বাধ্য করেনি; কিন্তু তাঁর ছেলেরা তাঁকে পূজো করতো। তাকে খুশি করার জন্যে সব কিছু করতে রাজি ছিলো।'

'এটাই স্বাভাবিক।'

'কিন্তু এটা উচিত নয়। ছেলেমেয়েরা বড় হলে তাদের কাছ থেকে বাবা-মার দূরে সরে পড়া উচিত। তাদের মাঝে থেকে তাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা ঠিক নয়।'

'আপনারা কোথায় যেতে চান?'

'লণ্ডনে। রউফের নামে ওখানে একটি বাড়ি আছে।'

সাহস সঞ্চয় করে বললাম, 'একটি প্রশ্ন করতে পারি?'

'বলো।'

'খুনী হিসাবে কাকে সন্দেহ করছেন?'

অনেকক্ষণ ধরে আমার মুখ খুটিয়ে লক্ষ্য করলেন, তারপর ক্লান্ত ভঙ্গিতে বলে উঠলেন, 'আন্দাজ করে কিছু বলা ঠিক নয়। শুধু এতোটুকু বলতে পারি, সাদিক আর রত্নাকে সন্দেহের তালিকায় রাখা যায়।'

একটু পর হাসিনা খালা ফিরে এলেন। সাবিনা উঠে চলে গেলে হাসিনা খালা আমাকে কাছে ডাকলেন, 'তোমাকে একটা কথা বলতে চাই জাহিদ।'

'বলুন।'

'আশা করি রহমানের কথায় তুমি কিছু মনে করোনি। ও বরাবরই এমন। ওকে দেখলে হার্টলেস মনে হলেও আসলে সে মোটেও তা নয়। কখনো তার বাবার ব্যবসাতে নিজেকে জড়াতে চায়নি। সব সময় নিজেকে গুটিয়ে রেখেছে। হয়তো নিজের অজান্তে রউফকে সে কিছুটা হিংসা করে। তাই তার দুঃসময়ে সঙ্গে সঙ্গে সাহায্যের হাত বাড়ায়নি। তুমি আবার তাকে ভুল বুঝো না।'

চোদ্দ

'লীনা বললো, এই হচ্ছে তোমার রুম।'

তিন মিনারের অন্যান্য ঘরগুলোর মতো এই ঘরটাও বেশ প্রশস্ত। আসবাবপত্র কম; কিন্তু টেকসই আর দামী। জানালা খুলে বাগানের দিকে তাকালাম। গা'টা কেমন যেন ছম ছম করে উঠলো। মাজেদা চৌধুরী বিনা নোটিসে ঘরে এসে ঢুকলেন। তারপর ঘরের একটি মাত্র চেয়ার দখল করে বসে পড়লেন, 'আচ্ছা বল্ তো তোরা, আজকের মিটিংটা কেমন লাগলো? হাসিনা খালার কারবার দেখলে, সম্পত্তির ভাগটা এখনো পায়নি, অথচ সেটা দেবার জন্য কিনা চাপাচাপি করলো। মূর্খ মহিলা, সারাটা জীবন শুধু স্যাক্রিফাইস করে গেল। তোর বাবাও তো আরেকটু হলে রউফের ফাঁদে পা দিয়েছিলো। বাপরে, যা ভয় পেয়েছিলাম। হাসিনা খালা তো একটা আজব চরিত্র। ভাবছি, একদিন আমি তার চরিত্রটা অভিনয় করে...'

লীনা ক্লান্ত ভঙ্গিতে বলে উঠলো, 'প্লীজ মা, তোমার

নাটকের কথা একটু থামাও।'

বললাম, 'ভদ্রমহিলা সত্যি তার ভাগ্নেদের জন্য অনেক ত্যাগ করেছেন। অথচ শুনলাম, উনি নাকি তার দুলাভাইকে মোটেও পছন্দ করতেন না।'

লীনার মা যেন আকাশ থেকে পড়লেন, 'কে বললো? উনি তো তার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন।'

লীনা চেঁচিয়ে উঠলো, 'মা। চুপ করো।'

'চুপ করবো কেন? সবাই তো জানে। তুই কি মনে করিস শুধু ইয়ং জেনারেশনই প্রেম করতে জানে।'

বিস্মিত হয়ে বললাম, 'কিন্তু হাসিনা খালা নিজেই সেকথা আমাকে বলেছেন।'

'প্রথম দিকে হয়তো তাই ছিলো। কিন্তু পরে তার প্রেমে পড়ে যান। রত্নাকে বিয়ে করার খবর শুনে আরেকটু হলে তো বুড়ি অজ্ঞান হয়ে গেছিলো।'

লীনা বললো, 'তুমি আর বাবাও তো খুব রেগে গিয়েছিলে।'

'হ্যাঁ। কিন্তু হাসিনা খালার মতো নয়। রত্নার দিকে তার অগ্নি-দৃষ্টি লক্ষ্য করিস না?'

'মা। যথেষ্ট হয়েছে।'

মাজেদা তার মেয়ের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসলেন, হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টে বললেন, 'একটা ডিসিশন নিয়ে ফেললাম। টিনাকে ঢাকায় নিয়ে হোস্টেলে রাখবো। এখানে তার আর থাকা উচিত নয়। একদম ঘরকুনো হয়ে গেছে। তার

সমবয়সী সঙ্গীর দরকার।'

'দাদু কিন্তু তাকে হোস্টেলে পাঠাতে চাননি।'

'উনি তো সবাইকে তার আশেপাশে দেখতে চাইতেন। ওখানে আজেবাজে ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় পাবে না টিনা। গোয়েন্দাগিরি করার ভূতটা ওর মাথা থেকে সরানো দরকার। ওর ভালোর জন্যই ওকে পাঠাচ্ছি।'

তার শেষ কথাটি কেন যেন বিশ্বাস করতে পারলাম না। মাজেদা তার মেয়ের ভালোর জন্য ওকে ঢাকায় পাঠাচ্ছেন নাকি টিনা অনেক কিছু জেনে ফেলেছে বলে তাকে বাড়ি থেকে অতোটা দূরে সরানো হচ্ছে?

পনেরো

পরের দিন সকালে নাস্তা সেরে সাদিকের সঙ্গে দেখা করার জন্য মাসুদের ঘরের দিকে যাচ্ছি—দরজার কাছে পৌঁছে সাদিকের গলা শুনতে পেলাম। সম্ভবত ইতিহাস পড়ানো হচ্ছিলো। কিছুক্ষণ পর আবিষ্কার করলাম, সাদিক সত্যি এক ঝানু মাস্টার। লেকচার শেষ করে সাদিক কয়েকটি প্রশ্ন করলো। টিনার উত্তর শুনে বুঝলাম, ছাত্রী হিসাবে সে মোটেও সুবিধার নয়। অপরদিকে মাসুদকে বুদ্ধিমান আর পড়ুয়া ছাত্র মনে হলো।

ঘরে নড়াচড়ার শব্দ পেয়ে চলে যাবো ভাবছিলাম, এমন সময় দরজাটা খুলে গেল এবং টিনা আর মাসুদ তড়িঘড়ি করে বের হয়ে এলো। প্রথম জন আমাকে দেখে কোনো কথা না বলে চলে গেল। মাসুদ জিজ্ঞেস করলো আমি কাউকে খুঁজছি কি না। বললাম, 'না। এমনি ঘুরেফিরে বাড়িটা দেখছিলাম।'

সাদিকও বের হয়ে এলো। আমাকে দেখে থমকে

দাঁড়ালো সে। তারপর সালাম জানিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

মাসুদ দুষ্টু হাসি হেসে বললো, 'আপনাকে দেখে ভয় পেয়েছেন। উনি অল্পতে ঘাবড়ে যান।'

'টিচার হিসাবে লোকটা ভালো।'

'হ্যাঁ। তাঁকে আমার ভালোই লাগে।'

'টিনা ছাত্রী হিসাবে কেমন?'

ঠোঁট উল্টালো মাসুদ, 'ও তো একটা ইডিয়ট। ডিটেকটিভ বই পড়ে পড়ে ওর মাথাটা নষ্ট হয়ে গেছে।'

'তোমার দাদুকে কেমন লাগতো মাসুদ?'

'কি জানি। খুব স্বার্থপর লোক ছিলো। মরে গিয়ে ভালোই করেছে।'

মোটেও অবাক হলাম না। চৌধুরী পরিবারের সবাই কম বেশি নিষ্ঠুর। একটু পর সাদিক ফিরে এলো। আমার দিকে একবার তাকালো। বুঝলাম, আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য ফিরেছে। মাসুদ করিডর ধরে হেঁটে চলে গেল। সাদিক অনেকক্ষণ কোনো কথা না বলে দাঁড়িয়ে থাকলো। সম্ভবত কথা বলার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। অবশেষে বললো, 'ওরা কিছু পেলো?'

'কারা?'

'পুলিস!'

'আসলে আমি ওদের লোক নই। তাই সব কথা ওরা আমাকে জানায় না।'

'কিন্তু আপনার বাবা সি. আই. ডি র একজন বড় অফিসার।'

'উনি আমাকে কিছু বলেন না।'

'পুলিস কি কাউকে...?' হঠাৎ করে চুপ হয়ে গেল সাদিক। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। অনেকক্ষণ পর দ্বিধা কাটিয়ে বললো, 'কাউকে কি গ্রেফতার করা হবে?'

'জানি না।'

'ইন্সপেক্টরের কথাগুলো তো আপনি সেদিন শুনেছিলেন। কি বলবো, বুঝতে পারছি না। মানুষের মন এতোটা নোংরা হয় কিভাবে? মিসেস রত্নার জন্য দুঃখ হয়। মাঝে মাঝে কি মনে হয় জানেন? এবাড়ির সবাই তাঁকে সরানোর জন্য ষড়যন্ত্র করছে।'

কিছু বললাম না। সে বলে গেল, 'ওরা অমানুষ। ওদের মনে কোনো দয়ামায়া নেই। ওদের কেউ কখনো আমার সঙ্গে একটি ভালো কথাও বলেনি। বরং সুযোগ পেলেই নানা ভাবে অপমান করে। আমার দোষ, আমি গরিব।'

আর এখানে থাকা উচিত নয় ভেবে হলরুমের দিকে রওনা দিলাম আমি। করিডর দিয়ে যাবার পথে হঠাৎ একটি ছোট দরজা খুলে গেল। দেখলাম টিনা ওটার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় ছিলে?'

তার উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে ভিতরে উঁকি দিলাম। দেখলাম, খালি একটা ঘর। সামান্য কিছু ভাঙাচোরা আসবাবপত্র পড়ে রয়েছে। এক কোণায় পুরানো, মর্চে পড়া একটি পানির ট্যাঙ্কও দেখতে পেলাম। বললাম, 'কি করছিলে এখানে?'

'গোয়েন্দাগিরি,' বললো সে। মুখে শয়তানী হাসিটা

লেগেই রয়েছে। আমার মুখের দিকে চেয়ে যোগ করলো, 'মনে হচ্ছে, নেক্সট্ খুনটা খুব শীঘ্রই হবে।'

কিছু বললাম না। সে বলে গেল, 'বইয়ে তো তাই থাকে। দ্বিতীয় ভিকটিম এমন একজন যে খুনীর পরিচয় জেনে ফেলে। তার মুখ বন্ধ করার জন্য তাকে খুন করা হয়,' সবজান্তার ভঙ্গিতে বললো সে।

'টিনা, একটু বাস্তববাদী হতে শেখো। জীবনটা কিন্তু বইয়ের মতো নয়।'

খুদে শয়তানটার কথা ভাবতে ভাবতে হাঁটছিলাম; হঠাৎ হলরুমের দরজা খুলে রত্না বের হয়ে এলো। আমাকে দেখে কাছে এলো, 'নতুন কিছু পেলেন?'

একই প্রশ্ন সাদিকও করেছিলো। তবে ভিন্ন উপায়ে। মাথা নাড়লাম। চিন্তিত মনে বলে উঠলো, 'শুনলাম আগামী কাল নাকি কেসটা কোর্টে পাঠানো হবে। তারপর কি হবে।'

'ভয় পাবার কিছু নেই। পুলিস আরো কিছু সময় চাইবে। তাদের কাজ এখনো শেষ হয়নি।' একটু থেমে যোগ করলাম, 'একটা উপদেশ দিচ্ছি। অনেকটা গায়ে পড়েই বলতে পারেন। কোনো সংবাদিকের সঙ্গে দেখা করবেন না। আমার মনে হয় আপনার এখন একজন উকিলের দরকার। আপনি কিন্তু একদম একা।'

স্মিত হেসে উত্তর দিলো রত্না, 'জানি। ধন্যবাদ জাহিদ সাহেব।'

হঠাৎ লীনা এসে জানালো, বাবা ফোন করে আমাকে এক্ষণি ঢাকায় রওনা হতে বলেছেন। খুব নাকি আর্জেন্ট।

ষোলো

বাবার অফিসে ঢুকেই বুঝলাম, নতুন কিছু একটা ঘটেছে। দেখলাম, বাবা চিন্তিত মনে বসে চুরুট টানছেন। মাহবুব জানালার পাশে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছেন। আর জামান সাহেব ঘরময় পায়চারি করছেন আর বিড়বিড় করে বলছেন, 'আশ্চর্য! ভাবতেও পারছি না, উনি আমাকে কি কারণে অবিশ্বাস করলেন।'

বাবা আমাকে দেখে হাসলেন, 'এসে গেছো। বোসো। নতুন খবর আছে।'

মাহবুবও আমার দিকে তাকিয়ে স্মিত হাসলেন। বাবা বললেন, 'আজ সকালে জামান সাহেব আলী আহমেদ নামে এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছেন। আলী আহমেদ মোবারক চৌধুরীর বাল্যবন্ধু ছিলেন। মোবারক তাঁকে খুবই বিশ্বাস করতেন। ভদ্রলোক চিঠিতে লিখেছেন যে, প্রায় এক বছর আগে মোবারক তার কাছে একটি খাম জমা দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন তাঁর মৃত্যুর পর ওটা যেন

জামান সাহেবের কাছে পাঠানো হয়। তিনি আরো জানিয়েছেন, অসুস্থতার কারণে মৃত্যুর সংবাদ তিনি মাত্র গত কাল পান। সঙ্গে সঙ্গে সীল মারা খামটা তিনি জামান সাহেবের কাছে পাঠালেন।' বাবা একটু দম নিয়ে বললেন, 'খাম খুলে জামান সাহেব খুবই অবাক হন। ওটার মধ্যে মোবারক চৌধুরীর নিজের হাতে লেখা একটি চিঠি এবং একটি সই করা উইল রয়েছে। উইলটা আইনসম্মতভাবে লেখা হয়েছে এবং এতে দুজন সাক্ষিরও সই আছে। সঙ্গে সঙ্গে জামান সাহেব এখানে ছুটে আসেন।'

জামান নার্ভাস ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন, 'এটা নতুন একটা উইল। পুরানোটার সঙ্গে এর কোনো মিলই নেই।'

আমার দিকে ফিরে একটি অর্থপূর্ণ হাসি উপহার দিয়ে বললেন, 'শুনলাম, মিস লীনার সঙ্গে নাকি আপনার বিয়ে হবে?'

'হ্যাঁ...। বোধ হয়...' একটু বিব্রতই হলাম।

'ভাগ্যবান বটে। মোবারক চৌধুরী উইলে রত্নার নামে ত্রিশ লক্ষ টাকা লিখে বাকি পুরো সম্পত্তিটা মিস লীনার নামে লিখে দিয়েছেন।'

হতভম্ব হয়ে গেলাম। বাবা আর মাহবুবের দিকে পালাক্রমে তাকালাম। দুজনের চোখে মুখে কৌতুকের চিহ্ন দেখতে পেলাম। অনেকক্ষণ পর চেঁচিয়ে উঠলাম, 'কী বললেন? পুরো সম্পত্তিটা লীনাকে লিখে দিয়েছেন? আশ্চর্য! নিশ্চয় এর পেছনে কোনো কারণ আছে।'

'চিঠিতে লিখেছে, লীনাই একমাত্র ব্যক্তি যে পরিবারের

দায়িত্ব নিতে পারবে। আমাদের কথা উল্লেখ করে লিখেছেন, রউফের মাথায় বুদ্ধি কম। তাকে কোনো দায়িত্ব দেয়া যায় না। রহমানের আত্মবিশ্বাসের অভাব আছে, আর মাসুদ এখনো অপরিণত। একমাত্র লীনাই তার স্বভাব পেয়েছে, বুদ্ধিমতী এবং সাহসী। হাসিনা খালার দেখাশোনাও সেই করতে পারবে। আরো লিখেছেন, হাসিনা খালার ঋণ টাকা দিয়ে শোধ করা যায় না। তাকে ছাড়া এতোগুলো ছেলেমেয়েকে মানুষ করা তার পক্ষে সম্ভব ছিলো না।'

তাজ্জব অবস্থা কাটিয়ে বললাম, 'মানুষটা সত্যি দূরদর্শী ছিলেন।'

জামানও সায় দিলেন, 'চিঠির প্রতিটি কথা আমি সমর্থন করি। দুঃখ হচ্ছে শুধু এইভেবে, চল্লিশ বছর তাঁর সঙ্গে কাজ করেও তাঁর বিশ্বাস অর্জন করতে পারিনি।'

বাবা বললেন, 'আসলে মানুষটাই জটিল ছিলেন, তার কাজকর্মও তাই হওয়া স্বাভাবিক।'

এমন সময় ফোনটা বাজলো। বাবা রিসিভার ধরে কানে লাগালেন। তারপর আমার দিকে ওটা বাড়িয়ে ধরলেন, 'তোমার ফোন। লীনা চৌধুরী।'

রিসিভার ধরে বললাম, 'লীনা?'

লীনার আতঙ্কিত কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, 'জাহিদ... তাড়াতাড়ি চলে এসো। টিনা...'

চেঁচিয়ে উঠলাম, 'কি হয়েছে তার?'

'মাথায় আঘাত পেয়েছে। বাঁচবে না বোধ হয়।'

সতেরো

কয়েক মিনিটের মধ্যে আমি আর মাহবুব জয়দেবপুরের পথে রওনা দিলাম। গাড়িতে বসে দ্বিতীয় ভিকটিম সম্পর্কে টিনার কথাগুলো মনে পড়লো। বেচারী হয়তো ভাবতেও পারেনি দ্বিতীয় ভিকটিম হিসাবে খুনী তাকেই বেছে নেবে। তিন মিনারে পৌঁছে দেখলাম, লীনা আমাদের অপেক্ষায় গেটের সামনে হাঁটাহাঁটি করছে। জানালো, টিনাকে হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। তার বাবা সঙ্গে আছেন। মাহবুব জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হয়েছিলো, খুলে বলুন প্লীজ।'

বাগানের পেছন দিকে একটি পুরানো ঘরে লীনা আমাদের নিয়ে গেল। দূর থেকে সহজে ওটা কারো নজরে পড়ে না। বললো, 'এখানে কেউ থাকে না। ঘরটা খালি পড়ে আছে। হাসিনা খালা বাগান সাফ করার কয়েকটা জিনিস এখানে রাখেন।'

দরজায় টাঙানো একটি পুরানো ছোট দোলনা দেখলাম। লীনা বললো, 'দোলনায় চড়ার জন্যে টিনা প্রতিদিন এখানে আসে। আগে মাসুদও আসতো, এখন আর আসে না।'

ঘরের ভিতরে ঢুকলাম। দেখলাম, দোলনার পাশে একটি ছোট পিতলের মূর্তি পড়ে আছে। লীনা বললো, 'কেউ একজন মূর্তিটাকে দরজার ওপর রেখেছিলো। দোলনার নড়াচড়ার ফলে ওটা সম্ভবত ওর মাথার ওপর পড়ে যায়।'

মাহবুব জিজ্ঞেস করলেন, 'কেউ কি এখানে কোনো কিছুতে হাত দিয়েছে?'

'না। কাউকে কিছু ধরতে দেইনি।'

'ভালো করেছেন। মেয়েটাকে কে পেয়েছিলো?'

'আমি। দুপুরে সে ভাত খেতে আসেনি। জিজ্ঞেস করতেই খোদেজা জনালো, তাকে বাগানের এদিকটায় হেঁটে আসতে দেখেছে। তাই ওকে খোঁজার জন্যে এদিকেই এসেছিলাম।'

'হুঁম। খুন করার জন্য আদর্শ জায়গা। কিন্তু একটা জিনিস মাথায় ঢুকছে না। খুনী তাকে এভাবে মারার কথা ভাবলো কেন?' দরজাটা ধরে উনি আস্তে করে ওটা খুলে আবার বন্ধ করলেন।

'এটা পুরোপুরি দুর্ভাগ্যের ব্যাপার ছিলো। মূর্তিটা ওর মাথায় না পড়ে, দূরেও পড়তে পারতো। টিনার ভাগ্যই খারাপ।'

মাটিতে কলম দিয়ে কয়েকটি সূক্ষ্ম দাগ দেখিয়ে বললেন, 'সম্ভবত খুনী মূর্তিটা রাখার আগে কাজটার সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছিলো। আঘাতের পরিমাণ কেমন?'

'ঠিক জানি না। তবে প্রচুর রক্ত পড়েছে।'

'জাহিদ, কি করছেন?' মাহবুব জিজ্ঞেস করলেন।

তিন পাওয়ালা একটা কাঠের চেয়ার পরীক্ষা করে দেখছিলাম। মাহবুব পাশে এসে দাঁড়ালেন। বললাম, 'আশ্চর্য। কেউ একজন চেয়ারটার ওপর দাঁড়িয়েছিলো। কাদার দাগ লেগে রয়েছে। কারণটা কি?'

মাহবুব লীনার দিকে ফিরে বললেন, 'ওকে ক'টার সময় খুঁজে পেয়েছিলেন?'

'একটার দিকে।'

'আর খোদেজা কখন তাকে দেখেছিলো?'

'তার বিশ কি পঁচিশ মিনিট আগে।'

'এর অর্থ ঘটনাটি খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে ঘটেছিলো।'

মাহবুব লীনার সঙ্গে তার মার সাথে দেখা করতে চলে গেলেন। আমি ওদের ছেড়ে রান্না ঘরের দিকে গেলাম। দেখলাম, খোদেজা বুয়া বসে বসে কাঁদছে। আমাকে দেখে চোখের পানি মুছে বললো, 'এবাড়িতে দুষ্টু আত্মা ঢুকেছে। প্রথমে বুড়ো মানুষটাকে মারলো, এখন ছোট বাচ্চা মেয়েটাও মরবে।'

'আচ্ছা বুয়া, বলতে পারো, ওর ছোট্ট ডায়েরীটা কোথায় পাওয়া যেতে পারে?'

খোদেজা মাথা নাড়লো। তবে কি ওটা খুনীর হাতে পড়েছে? নাকি এখনো সেটা ওর রুমেই আছে। টিনার রুম কোন দিকে জানতাম না। খোদেজাকে জিজ্ঞেস করে

সেদিকে পা বাড়ালাম। দরজার কাছে পৌঁছে মাহবুবের কণ্ঠ শুনতে পেলাম, 'জাহিদ, ভেতরে আসুন।'

ঘরে ঢুকেই তাজ্জব বনে গেলাম। মনে হলো কোনো এক দানব যেন সারাটা ঘরে তাণ্ডবলীলা চালিয়ে গেছে। ঘরের কোনো কিছুই আর আস্ত নেই। আলমারির প্রতিটি তাক পুরোপুরি খুলে মেঝেতে ফেলা হয়েছে। ভিতরের কাপড় এবং অন্যান্য জিনিসপত্র ঘরের চারদিকে ছড়ানো। বিছানার তোশক ফালি ফালি করে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। দেয়ালের ছবিগুলোও রেহাই পায়নি। সারা ঘর ভাঙা কাঁচের টুকরোয় ভরে গেছে। চেঁচিয়ে উঠলাম, 'হায় খোদা, এর মানে কি?'

'দেখতেই পাচ্ছেন?'

'কেউ একজন কিছু একটা খুঁজছিলো।'

'ঠিক তাই।'

'কিন্তু এতোক্ষণ এঘরে থাকলেও কেউ তাকে দেখলো না কেন?'

'আমি শুধু জানতে চাই, লোকটা কি খুঁজছিলো? এবং যা খুঁজছিলো, সেটা সে পেয়েছে কি না?'

মাহবুবের কথাগুলো আমার স্মৃতি শক্তিতে নাড়া দিলো। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ায় সেই পুরানো পানির ট্যাঙ্ক রাখা ঘরটার দিকে দৌড় দিলাম। টিনাকে এখানে শেষবার দেখছিলাম। জিজ্ঞেস করতে সে বলেছিলো এখানে গোয়েন্দাগিরি করছে। ভাবলাম, গোয়েন্দাগিরি করার মতো এখানে কি থাকতে পারে? চারদিকে খুঁজতে লাগলাম। নজরে

কিছু পড়লো না। ট্যাঙ্কের নিচে হাত দিয়ে খুঁজলাম, হাতে কিছু একটা বাঁধলো। জিনিসটা ধরে বের করে আনলাম। দেখলাম, চিঠিপত্রের একটি বড় বাণ্ডিল। ওটা খুলে একটি চিঠি বের করে পড়লাম,

প্রিয়, সাদিক,

গতকাল তোমার আবৃত্তি শুনে মুগ্ধ হলাম। যদিও আমার চোখের দিকে তাকাচ্ছিলে না, তবু জানতাম কথাগুলো আমাকেই বলছিলে। প্রিয়, খুব শীঘ্রই সব শেষ হয়ে যাবে। উনি আর বেশি দিন বাঁচবেন না। তাই তাকে এখন কিছু জানাতে চাই না। মানুষটা আমার সঙ্গে বরাবর ভালো ছিলো। মৃত্যুর আগে তাকে মানসিক কষ্ট দিতে চাই না।

আর পড়া নিরর্থক মনে হলো। টিনা ঠিকই বলেছিলো, আমি আসলেই একটা বোকা। মহিলাকে কতো সহজে বিশ্বাস করেছিলাম। মনটা বিষিয়ে উঠলো।

মাহবুবের কাছে গিয়ে বাণ্ডিলটা তাকে দিলাম, 'খুনী বোধহয় এটাই খুঁজছিলো।'

একবার চোখ বোলানোর পর মাহবুবের মুখে সন্তুষ্টির চিহ্ন ফুটে উঠলো, 'হ্যাঁ। আমরাও এটাকে খুঁজছিলাম। আমার মনে হয় রত্না বা সাদিকের আর কিছুই বলার নেই।'

ভাবলাম, কী ভয়ঙ্কর ওই মহিলা। আমাকে ঠকিয়েছে বলে নয়, তাকে আমি কখনো ক্ষমা করবো না, কারণ প্রথম খুনটা ঢাকার জন্য একটা ছোট নিষ্পাপ বাচ্চা মেয়েকে খুন

করতে যেতে তার হাত কাঁপেনি।'

মাহবুব বললেন, 'আমার মন বলছে, এটা সাদিকের কাজ। কেন জানেন?'

'কেন?'

'কারণ তার বুকের পাটা নেই। খুনী অন্য কেউ হলে সরাসরি মেয়েটাকে আঘাত করতো। দরজার ওপর মূর্তি রেখে ঝুঁকি নিতো না। কিন্তু সাদিক নিজ হাতে খুন করতে চায়নি।'

'আর আইজেরিনের ব্যাপারটা?'

'ওটা সম্ভবত রত্নার কাজ। যাই হোক, আপাতত আর কোনো প্রমাণের দরকার নেই। এই চিঠির বাণ্ডিলটাই ওদের গলায় ফাঁসির দড়ি পরানোর জন্য যথেষ্ট। টিনা হয়তো আবার সুস্থ হয়ে উঠবে। এবং তারপর এ বাড়িতে আশা করি আবার সুখ শান্তি ফিরে আসবে।' আমার দিকে চেয়ে চোখ টিপে হাসলেন, 'আবারো মোবারকবাদ জানাচ্ছি। বুঝলেন না, লীনা চৌধুরীর কথা বলছি। একে তো অপরূপা, তার ওপর কোটি টাকার মালিক।'

তাই তো! নতুন উইলটার কথা লীনাকে এখনো জানানোই হয়নি। মাহবুবকে বলতে, উনি জামানের উপর ওটা ছেড়ে দিতে বললেন।

সেদিন সন্ধ্যায় লীনার বাবা ফোন করে জানালেন টিনা সুস্থ হয়ে উঠেছে, তবে কয়েকদিন বিশ্রাম নিতে হবে। ডাক্তার কাউকে তার সঙ্গে দেখা করতে বারণ করেছে। এমন

কি তার মারও যাওয়া নিষেধ। লীনা খবরটা শুনে বললো, 'বিশেষ করে তার মা। আমি নিজেই ডাক্তারকে কথাটা বলেছিলাম।'

আমার দৃষ্টিতে বিস্ময় দেখতে পেয়ে হাসলো সে। বললাম, 'কি বলছো তুমি? উনি তো তার মা।'

'মাকে চেনো না তুমি। টিনাকে দেখার জন্য নয়, মা যেতে চায় হাসপাতালের ভিতরে একটি সীনক্রিয়েট করার জন্য। আর টিনার জন্য সেটা মোটেও ভালো হবে না।'

'সবকিছু আগেভাগে ভেবে রাখো কেন, বলো তো?'

একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ও বললো, 'ভাবতে হয়। দাদুর পর এ বাড়ির দেখাশোনা আমাকেই করতে হচ্ছে।'

ভাবলাম, বুড়োর বিচার বুদ্ধির তারিফ না করে উপায় নেই। বাড়ি ঘর বিষয় সম্পত্তি দেখাশোনা করার জন্য ঠিক লোককেই বেছে নিয়েছিলেন তিনি।

আঠারো

দু'দিন পর। তিন মিনারে লীনার সঙ্গে বাগানে বসে চা খাচ্ছিলাম। রত্নাও কিছুক্ষণ আগে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। এমন সময় মাহবুবের গাড়ি এসে আমাদের সামনে থামলো। রত্না অস্ফুট স্বরে বলে উঠলো, 'আবার এসেছে কেন? কি চায়?' লক্ষ্য করলাম, তার ঠোঁট দু'টো মৃদু কাঁপছে। লীনা বা রত্না কারো কাছেই তখনো চিঠির বাণ্ডিলের কথা বলা হয়নি। তাই মাহবুব যখন রত্নার পাশে এসে দাঁড়ালেন দুজনই চমকে উঠলো।

'ম্যাডাম, স্বামীকে হত্যা করার অভিযোগে আপনাকে অ্যারেস্ট করার ওয়ারেন্ট নিয়ে এসেছি। আপনাকে এখনই আমার সঙ্গে যেতে হবে।'

রত্না পুরোপুরি ভেঙে পড়লো। চেঁচিয়ে উঠলো, 'না। আমি তাঁকে খুন করিনি। এটা একটা ষড়যন্ত্র। বিশ্বাস করুন।'

তাকে আমি শান্ত করার চেষ্টা করলাম। বললাম, এতোটা

ভেঙে পড়লে চলবে কি করে। শক্ত হতে হবে। তাকে এখন একজন ভালো উকিল নিয়োগ করতে হবে। মাহবুব যাবার জন্য তাড়া লাগালেন। চোখ মুছতে মুছতে রত্না জিজ্ঞেস করলো, সাদিকের কি হবে? মাহবুব বললো, তাকেও গ্রেফতার করা হবে। আর কোনো প্রতিবাদ না করে রত্না তার সঙ্গে গাড়িতে উঠলো। সার্জেন্ট খলিলের সঙ্গে সাদিককেও ঘর থেকে বেরুতে দেখলাম। কিছুক্ষণ পর গাড়িটা আমাদের দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল।

কপালের ঘাম মুছে লীনার দিকে তাকালাম। বললো, 'হঠাৎ ওদের অ্যারেস্ট করলো কেন? কোনো প্রমাণ পাওয়া গেছে?'

'হ্যাঁ। কিছু চিঠিপত্র।'

'প্রেমপত্র?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু তবু বিশ্বাস হতে চায় না যে, রত্নাই খুনী। ওর জন্য একজন ভালো উকিলের দরকার।'

'এ নিয়ে আর চিন্তা কোরো না তো। ভালোয় ভালোয় সব শেষ হয়ে গেল। বাড়িতে এখন শান্তি ফিরে আসবে। ওটার দায়িত্ব তো এখন তোমার। উইলটার কথা শুনে নিশ্চয় খুব চমকে গিয়েছিলে। তাই না?'

'না। আমি আগেই জানতাম।'

'কি? কি বললে।' আমার হাত পা কেন যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

'অনেকদিন আগেই জানতে পেরেছিলাম।'

'কিন্তু কিভাবে?'

'দাদু নিজেই আমাকে বলেছিলেন।'

'আমাকে বলোনি কেন?'

'কারণ পরে শুনলাম উনি আরেকটা উইল করেছেন। ভাবলাম, হয়তো মত পাল্টে ফেলেছেন। তাই ভয়ে কাউকে কিছু বলিনি।'

'ভয়ে? কেন?'

'ভয় পেয়েছিলাম, পুলিস হয়তো খুনী বলে আমাকেই সন্দেহ করবে।'

উনিশ

দশ মিনিট পর বাড়ির সামনে আরেকটা গাড়ি এসে থামলো। আমি খুশিতে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম, 'টিনা এসেছে।'

মেয়েটার মধ্যে তেমন কোনো পরিবর্তন চোখে পড়লো না। কেবল মাথাটা ব্যাণ্ডেজ দিয়ে বাঁধা ছিলো। গাড়ি থেকে নেমেই দৌড় দিতে চাইলো। তার মা তার হাত ধরে টানলো; কোথায় যাচ্ছিস? আগে কিছু খাবি না?'

'না। খিদে নেই। আমার মাছগুলোকে দেখতে যাবো,' বলে আর দাঁড়ালো না।

মাজেদাকে বললাম, 'যেতে দিন। ওর একটু খোলা বাতাসের দরকার। আমি ওর সঙ্গে থাকবো।'

টিনাকে সেই রঙিন মাছের অ্যাকোয়ারিয়ামের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। আলাপ জমানোর চেষ্টায় বললাম, 'জানো টিনা, তুমি যখন হাসপাতালে ছিলে তখন এখানে অনেক কিছু ঘটেছে।'

আমার দিকে আড়চোখে তাকালো, কিছু বললো না।

বললাম, 'তোমার দাদু আরেকটা উইল লিখে লীনাকে তার সব সম্পত্তি লিখে দিয়েছেন।'

কাঁধ ঝাকিয়ে বললো, 'বাবা-মাকে বলাবলি করতে শুনলাম, কিন্তু আমি আরো আগে জানতাম।'

'হাসপাতালে থাকতে।'

'না। দাদুকে বলতে শুনেছিলাম।'

বুঝলাম, এটাও সে তার নিজস্ব পদ্ধতিতে শুনেছিলো। অন্য প্রসঙ্গে গেলাম, 'আরেকটু আগে এলে দেখতে পেতে কিভাবে পুলিস রত্না আর সাদিককে ধরে নিয়ে গেল।' ভেবেছিলাম এতে কাজ হবে। হলো না।

'দেখেছি।'

'অসম্ভব। তোমার আসার অনেক আগে ওরা চলে গিয়েছিলো।'

'রাস্তায় দেখা হয়েছিলো।'

ঠিক এই সময় হাসিনা খালার ডাক শোনা গেল। টিনা তার কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ কথা বলে বাড়ির ভিতর ঢুকে গেল। আমি হাসিনা খালার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। তাঁকে কেন যেন সেই মুহূর্তে খুব রুগ্ন আর চিন্তিত দেখাচ্ছিলো। আমাকে দেখে একটু হাসার চেষ্টা করলেন, 'মেয়েটাকে সুস্থ অবস্থায় দেখে ভালোই লাগছে। জানালা দিয়ে পুলিসকে রত্না আর সাদিককে নিয়ে যেতে দেখলাম। রত্নার জন্য খারাপ লাগছে। ওর জন্য একজন ভালো উকিল নিয়োগ করতে হবে।'

আরেকবার বিস্মিত হলাম। লীনার মুখেও কথাটা

শুনেছিলাম। তারা দুজনেই রত্নাকে ঘৃণা করে, অথচ এখন তাঁকে বাঁচানোর কথা বলছে। হাসিনা খালা বললেন, 'জানি কি ভাবছো। আসলে আমি চাই তার ন্যায় বিচার হোক। তা না হলে দুলাভাইয়ের আত্মা আমাদের ক্ষমা করবে না।' আমার দিকে চেয়ে আরেকবার হাসলেন, 'তুমি তো আর কদিন পর আমাদেরই একজন হবে। চলো আজ আমাদের সঙ্গে যাবে।'

'না। আজ নয়। ঢাকায় ফিরতে হবে।'

'সঙ্গে গাড়ি আছে?'

'জ্বি।'

'তাহলে একটু অপেক্ষা করো। আমিও যাবো। তবে কাউকে কিছু বলো না।'

অবাক হলেও কোনো প্রশ্ন করলাম না। পথে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলাম, তাকে কোথায় নামিয়ে দেবো। বললেন, 'পিজি হাসপাতালে।'

পিজির সামনে গাড়ি থামিয়ে দিলাম। বললাম, 'আশা করি কোনো অসুখ...'

আমার কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, 'তেমন কিছু না। রুটিন চেকআপ করবো। এজন্য কাউকে জানাতে চাইনি। লীনাদের কেউ শুনলে ঘাবড়ে যেতো। খোদা হাফেজ জাহিদ।'

বিশ

'বাবার অফিসে গিয়ে দেখি, উনি অন্য একটা কেস নিয়ে ব্যস্ত আছেন। তাই মাহবুবের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তার সাফল্যের জন্য মোবারকবাদ জানালাম। কেন যেন তাঁকে খুব একটা সন্তুষ্ট মনে হলো না। বললেন, 'আমি তো কিছুই করিনি। সাফল্যের দাবিদার তো আপনি।'

'কোর্ট কি রায়/দেবে বলে মনে হয়?'

'কিছুই বলা যাচ্ছে না। চিঠিগুলো কোনো শক্ত প্রমাণ নয়। চিঠিতে বুড়োর মৃত্যুর কথা লেখা থাকলেও ওরা বলতে পারে ওটা স্বাভাবিক মৃত্যুর কথা বলা হচ্ছিলো। খুনের কথা ওরা কোথাও উল্লেখ করেনি। বুড়োর প্রায় আশি বছর বয়স ছিলো। কাজেই তার মৃত্যু আশা করা তার যুবতী স্ত্রীর পক্ষে স্বাভাবিক।'

'আপনার কি ধারণা?'

'আমি আমার কর্তব্য করেছি। রায় দেয়া তো আদালতের কাজ।'

তার টেবিলের ওপর রাখা রিসিভার ফোনটা বাজলো। ধরে মাহবুব কিছুক্ষণ শুনলেন। তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, 'আপনার একটি ফোন-কল এসেছে। আপনার বাবার রুমে।'

বাবার অফিসরুমের দিকে দ্রুত পদক্ষেপে চলে গেলাম। বাবা আমাকে দেখে ফোনের দিকে ইশারা করলেন। রিসিভার ধরতেই লীনার ভয়ার্ত কণ্ঠ কানে এলো। 'লীনা? কি ব্যাপার?'

'ওহ্ জাহিদ। খুনী এখনো এ বাড়িতেই আছে।'

'কি বলছো? টিনা...?'

'না। টিনা না। খোদেজা বুয়াকে...' ফুঁপিয়ে ওঠার শব্দ শুনতে পেলাম।

'খোদেজা বুয়া...?'

'হ্যাঁ। টিনার গ্লাসে কিছু দুধ কফি ছিলো। টিনা সামান্য খেয়ে রেখে দিয়েছিলো। বুয়া ওটা ফেলে না দিয়ে খেয়ে ফেলেছিলো। উনি প্রায়ই এমন করতেন। বোধহয় বিষ ছিলো।'

'ওহ্ গড্। তার কি অবস্থা?'

'মরে গেছে।'

একুশ

মাহবুবের সঙ্গে অভিশপ্ত তিন মিনারের পথে আবার রওনা হলাম। এবারের যাত্রাটাকে সবচেয়ে দীর্ঘ মনে হলো আমার কাছে। বিড়বিড় করে মাহবুবকে বলতে শুনলাম, 'রত্না তাহলে খুনী নয়।'

উত্তর দিলাম, 'না। খুনী এখনো তিন মিনারেই আছে।'

তিন মিনারে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে অপরিচিত এক পুলিস সার্জেন্ট মাহবুবকে একপাশে টেনে কানে কানে কি যেন বললো। গেটের ভিতর প্রবেশ করে বাগানের এক কোণায় কিছু লাগেজ দেখতে পেলাম। একটু পরে সাবিনা চৌধুরীকে আমার দিকে এগিয়ে আসতে দেখলাম। আমাকে দেখে স্মিত হাসলেন, 'ভালোই হয়েছে, তোমার সঙ্গে দেখা হলো জাহিদ। আমরা চলে যাচ্ছি।'

'আজই?'

'হ্যাঁ। আজকের রাতটা ঢাকায় একটি হোটেলে কাটিয়ে কাল লণ্ডনের ফ্লাইট ধরবো।' স্বাভাবিক ভাবে কথা বললেও,

তাঁকে কিছুটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মনে হলো। বললাম, 'পুলিস বোধহয় আজ যেতে দেবে না।'

'কেন?'

'বাড়িতে আরেকটা খুন হয়েছে।'

'আমাদের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। ঘটনাটি যখন ঘটে তখন আমি বা রউফ কেউই ডাইনিং রুমে ছিলাম না।'

'পুলিস এতো সহজে কাউকে বিশ্বাস করে না।'

'অবাস্তব। খোদেজা বুয়ার মতো এক বেচারিকে খুন করে আমাদের কি লাভ।'

'তাকে মারার জন্য দুধে বিষ রাখা হয়নি।'

'হায় খোদা। টিনা…? সে তো একটা বাচ্চা মেয়ে। তাকে কে খুন করতে যাবে?'

'টিনা সাধারণ বাচ্চা মেয়ে নয়।'

ঠিক এই সময় টিনাকে দেখতে পেলাম। তার চোখে মুখে উত্তেজনার চিহ্ন দেখতে পেলাম। আমাদের পাশে এসে দাঁড়ালো, 'কি মজা, তাই না? খোদেজা বুয়াও খুন হলো।'

ইচ্ছা করলো, গালে একটি চড় মারি। ইচ্ছাটাকে দমন করে বললাম, 'খোদেজা বুয়ার জন্য খারাপ লাগছে না তোমার?'

'না। আমাকে সব সময় বকাবকি করতো।'

'এমন কি কেউ নেই টিনা, যাকে তুমি পছন্দ করো।'

সাবিনার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বললো, 'হাসিনা খালাকে পছন্দ করি। মাসুদকেও আগে করতাম, কিন্তু খুনী

ধরতে সে আমাকে কোনো সাহায্য করছে না।'

'খুনী ধরাটা কোনো ছেলেখেলা নয় টিনা। তোমার এখন একটু সাবধান হওয়া উচিত। ওসব খোঁজাখুজি বন্ধ করো।'

'আর খুঁজতে হবে না। আমি এখন সব জানি...'

হঠাৎ সে থেমে গেল। পেছন দিকে একটা শব্দ শুনতে পেলাম। ফিরে দেখি, হাসিনা খালা আমাদের দিকে আসছেন। চোখ দুটো টিনার মুখের ওপর স্থির হয়ে আছে। টিনার হাত ধরে তাকে টেনে কাছে এনে আমি বললাম, 'এসো। তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

তাকে ড্রইংরুমে নিয়ে একটি সোফায় বসিয়ে দিলাম, তার পাশে বসে পড়লাম, 'এখন বলো তো দেখি, কি জানো তুমি?'

'অনেক কিছু।' দুষ্টু হাসিটা এখনো লেগে রয়েছে ওর মুখে।

ধৈর্যহারা হলাম না, 'দুধে কে বিষ মিশিয়েছিলো তুমি জানো?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলো।

'এবং দোলনা ঘরে তোমাকে কে খুন করতে চেয়েছিলো, তাও জানো?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে এখনই তার নাম বলো। এই মুহূর্তে।'

'না।'

'মাহবুবকে জানানো তোমার কর্তব্য।'

'মাহবুবকে আমার ভালো লাগে না। উনি একটা বোকা। ভেবেছিলো ছোট দাদী খুনটা করেছে। কিন্তু আমি জানতাম, ছোট দাদী বা স্যার খুনী নয়।'

'টিনা। স্বীকার করি, তুমি আমাদের সবার চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধি রাখো। কিন্তু খুনীর পরিচয় না জানালে তাকে ধরবো কি ভাবে। তোমার জীবনের কি কোনো মূল্য নেই তোমার কাছে?'

মাথা ঝাঁকালো সে।

'তাহলে বলে ফেলো। দেখো টিনা, দরকার হলে তোমাকে আমি বলতে বাধ্য করবো।'

'তখন আমি মিথ্যা বলবো।' ফুঁসে উঠলো একগুঁয়ে মেয়েটা।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লাম, 'মিথ্যা বলে লাভ?'

'বুঝতে পারছেন না কেন? খুনী তো এমন একজন হতে পারে তাকে আমি ভালোবাসি, যার ক্ষতি আমি চাই না।' এতোটুকু বলে একটু থামলো, যেন তার কথাগুলো হৃদয়ঙ্গম করার সময় দিচ্ছে। আবার বলে উঠলো, 'তবে যেদিন মনস্থির করবো খুনীর নাম বলবো, সেদিন একটা মিটিং-এর ব্যবস্থা করে সবাইকে ডাকবো। তারপর সবার সামনে খুনীর দিকে ইশারা করে বলবো, এই দেখো, এই হচ্ছে আসল খুনী।' হাতটা লম্বা করে আঙুল তুলে ইশারা করে দেখালো, ঠিক সেই মুহূর্তে হাসিনা খালা ঘরে এসে ঢুকলেন। টিনার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চল টিনা। আমার সঙ্গে গাড়িতে করে বেড়াতে যাবি।'

খুশি মনে উঠে দাঁড়ালো টিনা। হাসিনা খালা আরো বললেন, 'যা, চুলটা ঠিক করে আয়। জাহিদ তুমিও যাও ওর সঙ্গে। আমাকে দুটো চিঠি লিখতে হবে বেশিক্ষণ লাগবে না।'

হাসিনা খালা না বললেও টিনার সঙ্গে আমি যেতাম। চিরুনি দিয়ে টিনার চুলগুলো আঁচড়ে দিলাম। ও অনেক বকবক করলো; কিন্তু খুনী সম্পর্কে কিছু বললো না। বেণী করা প্রায় শেষ; এমন সময় লীনা ঘরে এসে ঢুকলো। আমাকে ঐ অবস্থায় দেখে ব্যঙ্গ করে হাসলো, 'কি ব্যাপার জাহিদ। জানতাম না তো, তুমি মেয়েদের হেয়ার ড্রেসার হয়ে গেছো।'

বিব্রত হলেও তার মুখের দিকে চেয়ে হাসলাম। দেখলাম, দুশ্চিন্তায় তার মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে আছে। নিচে নেমে দেখলাম, হাসিনা খালার চিঠি লেখা শেষ হয়ে গেছে। বললেন, 'চলো টিনা। গাড়িটা বের করতে বলেছি।'

গাড়ি পর্যন্ত আমি আর লীনা ওদের পৌঁছে দিলাম। আকাশের দিকে চেয়ে হাসিনা খালা বললেন, 'আহ্। কি সুন্দর পরিষ্কার আকাশ। আজ বোধহয় কোনো বৃষ্টি হবে না।'

গাড়িতে ওঠার আগে লীনার গালে চুমু দিয়ে বললেন, 'চিন্তা করিস না। সব ঠিক হয়ে যাবে। মনটা শক্ত কর। কিছু কিছু দায়িত্ব আছে যা এড়িয়ে যাবার উপায় নেই।'

ড্রাইভিং সীটে উঠে বসলেন হাসিনা খালা। পাশে টিনা উঠে বসলো। হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে তিনি চলে গেলেন গাড়িতে করে। লীনাকে বললাম, 'জানতাম না উনি, ড্রাইভিং জানেন।'

'গত বছর আমার কাছে শিখেছেন।'

'টিনাকে বাড়ির বাইরে নিয়ে গিয়ে ভালোই করেছেন। আমার মনে হয় কথা বলার জন্য মেয়েটাকে জোর করা উচিত। হয়তো সে কিছুই জানে না। ওর দেমাক বেশি। দুটো চড় মারলে ঠিকই গড়গড় করে বলে দেবে সব।'

ক্লান্ত ভঙ্গিতে হেসে উঠলো লীনা। প্রসঙ্গ পাল্টালাম, 'দুধে কি বিষ মেশানো ছিলো?'

'সম্ভবত ডিজাল্টিন। হার্টের ওষুধ। হাসিনা খালা ব্যবহার করেন। শিশিটা তাঁর রুমে খালি অবস্থায় পাওয়া গেছে।'

বাইশ

সূর্য প্রায় অস্তাচলের পথে চলেছে, এখনো হাসিনা খালা বাড়িতে ফেরেননি। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললাম, 'আশ্চর্য, চার ঘন্টা কেটে গেল, এখনো ফিরলো না। গেল কোথায়?'

লীনা বললো, কি জানি। চলো, ভেতরে চলো।'

ভিতরে গিয়ে চা নাস্তা খেলাম। আরো এক ঘন্টা কেটে গেল। সবাই অস্থির। মাহবুব তখনও বাড়িতেই ছিলেন। ব্যাপারটা জানাতে উনি সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা জায়গায় ফোন করলেন। বললেন, খবর পেলে সঙ্গে সঙ্গে জানাবেন। হলরুমে ঢুকে দেখলাম লীনা শাড়ির আঁচল চোখে চেপে নিরবে কাঁদছে। আমাকে দেখে বললো, 'নিশ্চয় কিছু একটা হয়েছে। হায় খোদা, কি হবে এখন?'

সাতটার দিকে গম্ভীর মুখে মাহবুব আমাদের কাছে দুঃসংবাদটা নিয়ে এলেন। লীনার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দুঃখিত মিস লীনা, একটা দুঃসংবাদ আছে। আমাদেরই ডিপার্টমেন্টের একজন গাড়িটাকে উত্তর দিকে যেতে

দেখেছিলো।'

'উত্তর দিকে?' লীনা অস্ফুট কণ্ঠে বললো, 'ওদিকে কোথায় গেল?'

কেশে গলাটা পরিষ্কার করলেন মাহবুব। তারপর বললেন, 'গাড়িটা ভালুকা পেরিয়ে কিছুদূর যাবার পর ব্রীজ থেকে একটু নিচে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে যায় নদীতে। ভেতরে দুটো লাশ পাওয়া গেছে...'

পেছনে একটা আর্তনাদ শুনতে পেলাম, 'টিনা...'

ফিরে দেখি, মাজেদা দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন। বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে তাঁকে। শাড়ির আঁচলটা কাঁধ থেকে খসে পড়েছে, আবার চিৎকার করে উঠলেন, 'টিনা–আ। না। বিশ্বাস করি না,' টলে উঠলেন মাজেদা। লীনা গিয়ে তাকে ধরলো।

চিঠি দুটোর কথা মনে পড়লো। গাড়িতে ওঠার সময় ওগুলো হাসিনা খালার হাতে ছিলো না। নিশ্চয় এখনো ড্রয়িংরুমে আছে। সেদিকে দৌড় দিলাম। ঠিকই আন্দাজ করেছিলাম। টেবিলের ওপরেই ওগুলো রাখা আছে। একটির ওপর মাহবুবের নাম লেখা আছে দেখলাম। মাহবুবও আমার পিছে পিছে এসেছিলেন। তাঁকে চিঠিটা দিলাম। খামটা খুলে উনি চিঠিটা জোরে জোরে পড়লেন।

'চিঠিটা যখন খোলা হবে, আমি তখন এই পৃথিবীটা থেকে অনেক অনেক দূরে। বেশি কিছু বলার প্রয়োজন মনে করি না। সংক্ষেপে বলছি। মোবারক চৌধুরীর

মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী। খোদেজার মৃত্যুও আমার কারণেই ঘটেছে। রত্না এবং সাদিক নির্দোষ। আমার ব্রেনে টিউমার হয়েছে, তিন মাসের বেশি বাঁচবো না। ডাক্তারের কাছে খোঁজ নিয়ে জানতে পারবেন। ভাবলাম, মরতে যখন হবেই, একটু আগেই না হয় মরি। আশা করি আমার স্বীকারোক্তি কোর্টে দেখিয়ে রত্না আর সাদিককে নির্দোষ প্রমাণ করা যাবে।'

হাসিনা বেগম।

লীনাও অবিশ্বাসের সঙ্গে চিঠির কথাগুলো শুনলো, 'হাসিনা খালা? কিন্তু কেন?'

তারপর সেই প্রশ্নটা করে বসলো, যেটা আমার মনেও উঁকি দিয়েছিলো, 'আর টিনা? তার কি দোষ? তাকেও উনি মারলেন কেন?'

বললাম, 'হ্যাঁ। তাকে সাথে করে নিলেন কেন?'

প্রশ্নটা করলেও উত্তরটা সম্ভবত নিজের অজান্তে জানা ছিলো। দ্বিতীয় খামটা তখনও আমার হাতে ছিলো। প্রথমটার চেয়ে এটা ওজনে অনেক বেশি ভারি। খামটা খুলে ওটার ভিতর থেকে প্রথমে টিনার সেই বিখ্যাত ছোট ডায়েরীটা বের করে আনলাম। প্রথম পাতাটা খুলে পড়লাম, লীনা আমার কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলো। টিনা লিখেছে, 'আজ দাদুকে আইজেরিন দিয়ে খুন করলাম।'

তেইশ

ওহ। কী নির্বোধ আমি। সূর্যের আলোর মতো পরিষ্কার ছিলো ব্যাপারটা; অথচ আমাদের কেউই তা বুঝলো না। সবাইকে সন্দেহ করলেও একমাত্র টিনাকে বয়েসের কারণে সন্দেহ করা হয়নি। অথচ ও-ই ছিলো আসল খুনী।

তার অহঙ্কার, নিজেকে নাটকের মধ্যমণি করার প্রয়াস, পুলিসের চেয়ে অনেক বেশি জানে বলে তার গর্ববোধ, সবই প্রমাণ করে সে-ই ছিলো আসল খুনী। তার দাদুকে খুন করতে তার কোনো কষ্টই করতে হয়নি, এমনকি কোনো বুদ্ধিও খাটাতে হয়নি। তার দাদু নিজেই খুনের পরিকল্পনাটা তাকে দেখিয়ে গেছেন। আর আঙুলের ছাপ লুকানো কৌশলটা ডিটেকটিভ বই পড়ে পড়ে ভালোভাবেই সে আয়ত্ত করেছিলো। দোলনা ঘরের ঘটনাটাও তারই সাজানো ছিলো। তার প্রমাণ চেয়ারটার ওপর সেই কাদা মাখা পায়ের চিহ্ন। একমাত্র টিনার পক্ষেই চেয়ার ছাড়া দরজার নাগাল পাওয়া সম্ভব ছিলো না।

আঘাতটার কারণে তার মৃত্যুও যে হতে পারে, এই চিন্তাটা তার মাথায় আসেনি। কারণ বইয়ে প্রধান চরিত্রের মৃত্যু কখনো হয় না, সে মরতে পারে না।

অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পুরানো পানির ট্যাঙ্ক রাখা ঘরের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলো। আর নিজের ঘর তছনছ করে আমাদেরকে একেবারে বেকুব বানিয়ে দিয়েছিলো।

টিনা হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে দেখলো, রত্না আর সাদিককে গ্রেফতার করে নেয়া হয়েছে। বুঝলো উত্তেজনা কমে যাওয়ার পথে। তার রোমাঞ্চ স্তিমিত হয়ে আসছে। তাই ঠিক করলো, নতুন করে উত্তেজনা সঞ্চার করার জন্য, তাকে আরেকটা খুন করতে হবে। তাই দুধের গ্লাসে বিষ মিশিয়ে টেবিলের ওপর রাখলো। জানতো অভ্যাসমতো খোদেজা ওটা খাবে। হয়তো খোদেজাকে পছন্দ করতো না বলে, অথবা খোদেজা তাকে সন্দেহ করেছিলো বলে, তাকেও দুনিয়া থেকে সরানো উচিত মনে করলো সে।

ওকে কখনো আমার কাছে স্বাভাবিক মনে হয়নি। সম্ভবত ওর দাদুও সেটা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই, স্কুলে না পাঠিয়ে বাড়িতে তার লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেছিলেন।

আর মাজেদা? তিনি কি জানতেন? আমার মন বলছে, জানতেন। আর তাই মেয়েকে হোস্টেলে পাঠাতে চেয়েছিলেন। আর হাসিনা খালা? একমাত্র উনিই টিনার বিকৃত মানসিকতা সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন। ডায়েরীটার

সঙ্গে আমার নামে একটি চিঠি দেখতে পেলাম। ওটা খুলে পড়লাম,

'প্রিয় জাহিদ,

সত্যি কথাটা বলার জন্য তোমাকেই বেছে নিয়েছিলাম। তুমি যদি ভালো মনে করো, তবে লীনাকে জানাতে পারো। টিনার ডায়েরীটা আজকে পড়লেও ওকে আমি অনেক আগেই চিনতে পেরেছিলাম। ছোটবেলা থেকেই ওকে আমার স্বাভাবিক মনে হতো না। ডায়েরীটা আমার সন্দেহকে নিশ্চিত করলো। ওটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করলাম ওকে মেরে ফেলতে হবে। তুমিই বলো, আমি কি ঠিক কাজটাই করতে যাচ্ছি? জানি না। ওর বাবা-মা কখনো ওকে বুঝতে পারেনি। ওকে আমি পুলিসের হাতে ধরিয়ে দিতে পারবো না। আমি চাই না, এতোটুকু মেয়ে জেলখানার কষ্ট পেয়ে মরুক। তাই ঠিক করলাম ওকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাবো। এটা ওর নিয়তি। তা না হলে এই স্বভাব নিয়ে ও জন্মালো কেন? জানিনা তোমরা কি ভাবছো। হয়তো ভুল করছি, যে ক্ষেত্রে তোমরা আমাকে ক্ষমা করো। খোদা জানেন, ওর ভালোর জন্যই কাজটা করছি। ওকে ভালোবাসি বলে করছি। খোদা তোমাদের মঙ্গল করুন।

হাসিনা খালা।

লীনাকে চিঠিটা পড়তে দিলাম। কম্পিত হাতে চিঠিটা নিয়ে পড়তে লাগলো ও। ওর পড়া শেষ হলে টিনার ডায়েরীটা

খুলে পড়লাম। পড়তে পড়তে মেয়েটার জন্য করুণা বোধ না করে পারলাম না। খুব সহজ ভাষায় কাঁচা হাতে লিখেছে, 'আজ দাদুকে খুন করলাম। উনি আমাকে সব সময় নাচ শিখতে বারণ করতেন। মাকে বলেন, আমাকে দিয়ে কিছু হবে না। তাই তাকে খুন করলাম।'

পরের পৃষ্ঠায় লিখেছে, 'মা আমাকে হোস্টেলে পাঠাতে চায়। কিন্তু আমি যেতে চাই না। মা জোর করলে তাকেও খুন করবো।

'ভাইয়া বলে মেয়েরা কিছু পারে না, কিছুই জানে না। যখন জানবে দাদুকে আমিই খুন করেছি, তখন নিশ্চয় আমাকে ভয় পাবে। আমার সাথে বুঝে শুনে কথা বলবে।

'জাহিদ ভাইয়া ভালো, কিন্তু খুব বোকা। মা ঠিকই বলেছে, ছোট দাদী একটি ডাইনী। আমাকে মোটেও সহ্য করতে পারে না।

'খোদেজা বুয়া আমাকে হোস্টেলে পাঠানোর জন্যে মাকে তাগাদা দিচ্ছে। আমি তাকে খুন করবো।

'আরেকটা খুন হলে বাড়িতে আবার পুলিস আসবে। তখন আবার রোমাঞ্চ শুরু হবে।'

শেষ পৃষ্ঠায় টিনা লিখেছে, 'খোদেজা বুয়াকে খুন করলাম। বুঝতে পারছি না, ওষুধের শিশিটা কোথায় লুকোবো। হয়তো ভাইয়ার রুমে রেখে দেবো। পুলিস তখন তাকেই সন্দেহ করবে।

'পুলিসকে খবর দেয়া হয়েছে। কি মজা। জানি, পুলিস কিছুই করতে পারবে না। আমি যখন বুড়ো হয়ে যাবো তখন

ডায়েরীটা মাহবুবের কাছে পাঠিয়ে দেবো। ওটা পড়ে ইন্সপেক্টর আর জাহিদ ভাই ভাববে, মেয়েটা কতো বড় জিনিয়াস ছিলো। অপরাধ জগতে আমি একটি কিংবদন্তী হয়ে থাকবো।'

ডায়েরীটা বন্ধ করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লাম। লীনা ফুঁপিয়ে উঠলো, 'হায় খোদা। কী নিষ্ঠুর। ও মানুষ ছিলো না। প্রেত ছিলো। তবু ওর জন্য দুঃখ হয়। বড় কষ্ট হয়।'

বললাম, 'হ্যাঁ। নিজের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিলো না ওর। ওই বিকৃত মস্তিষ্ক নিয়েই ওর জন্ম হয়েছিলো। এতে ওর নিজের কোনো হাত ছিলো না।'

চোখের পানি মুছতে মুছতে লীনা জিজ্ঞেস করলো, 'বেঁচে থাকলে ওর কি হতো?'

মাহবুব এতোক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন। উনিই উত্তর দিলেন, 'সম্ভবত আঠারো বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কোনো মেন্টাল হাসপাতালে বা কোনো কিশোর অপরাধ নিরাময় কেন্দ্রে পাঠানো হতো। পরে সুস্থ না হলে তাকে কারাগারে রাখা হতো।'

লীনা আবার ফুঁপিয়ে উঠলো, 'হাসিনা খালা বোধহয় ঠিক কাজটাই করেছেন। তাই না?'

তার কাঁধে হাত রেখে বললাম, 'হ্যাঁ। উনি নিজের মহামূল্যবান জীবনটাই তোমাদের জন্য ত্যাগ করে গেছেন। আর এটাই ছিলো তাঁর মহত্তম ত্যাগ।'

শেষ